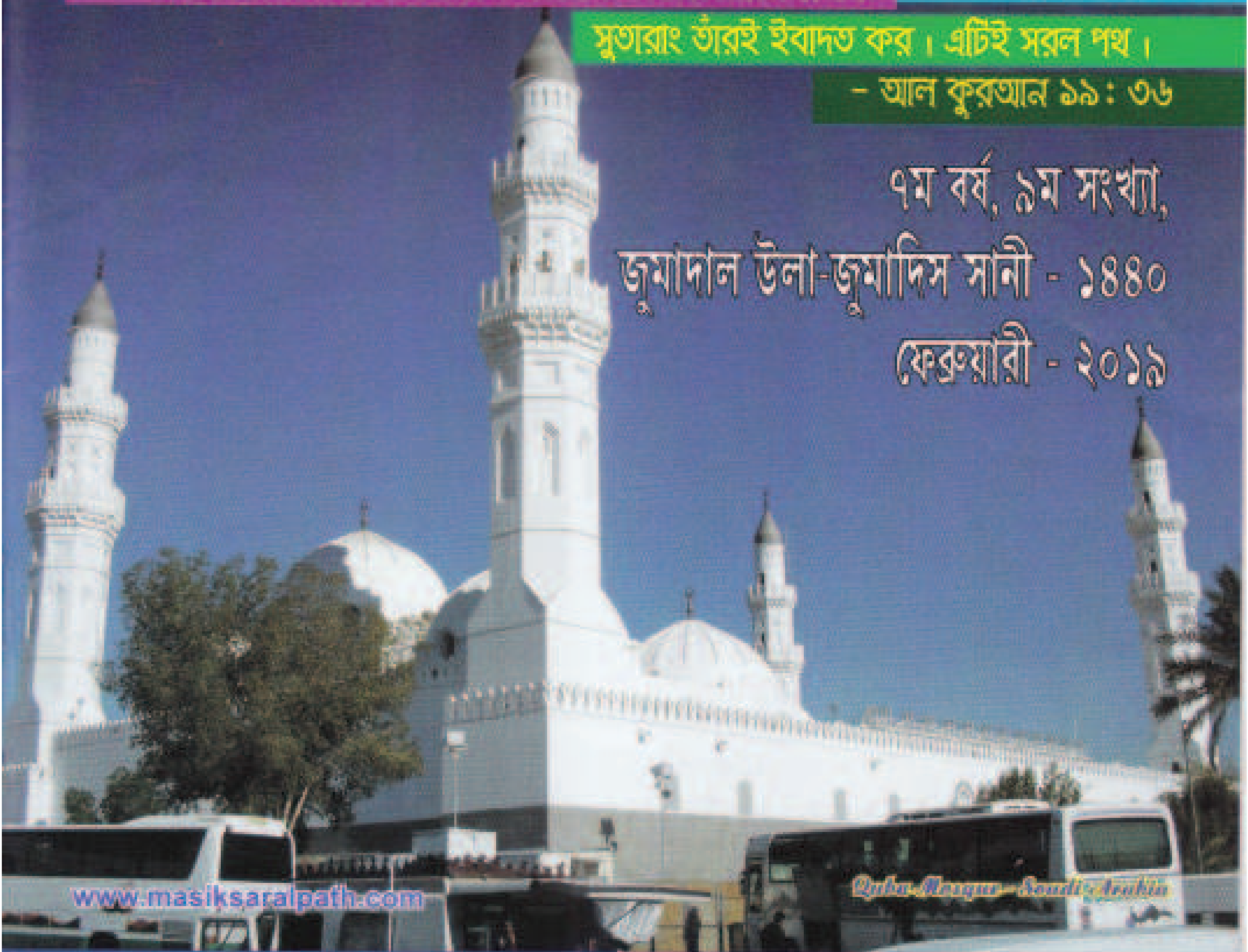
মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।
- আল কুরআন ১৯: ৩৬

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
জুমাদাল উলা-জুমাদিস সানী - ১৪৪০
ফেব্রুয়ারী - ২০১৯



بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৭ম বর্ষ ঃ	৯ম সংখ্যা
জুমাদিউ উলা-জুমাদিস সানী ঃ	১৪৪০ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ঃ	১৪২৫ বাংলা
ফেব্রুয়ারী ঃ	২০১৯ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ

সম্পাদক, মাসিক সরল পথ

উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)

পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫

মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)

জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ

এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪

Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

মাদ্রাসা শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা ঃ উত্তরণের পথ

বাংলার নিযামিয়া মাদ্রাসাগুলি এক সময় ছিল আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, হাদীস ও কুরআন শিক্ষার পীঠস্থান, যেখান থেকে উত্তীর্ণ হত হাজার হাজার যোগ্যতম ও পারদর্শী আলেম। যারা মুসলিম সমাজকে সঠিক ঈমান ও আকীদার পথ দেখাত। বেশ কয়েক দশক ধরে বাংলার সেই নিযামিয়া মাদ্রাসাগুলি ধীরে ধীরে নিজস্ব সত্তা ক্রমশ হারাতে বসেছে। যুগের হাওয়া লেগে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের জন্য নির্মিত হয়েছে উন্নত ছাত্রাবাস, শ্রেণিকক্ষ ও আলিশান ভবন, সুস্থ ও সুষম খাবারেরও ব্যবস্থা হয়েছে তাদের জন্য এবং সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নও বহুত হয়েছে, যুগের হাওয়া লাগেনি কেবল শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফলে ছাত্ররা ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও কুরআন-হাদীস প্রায় সব বিষয়েই অপরিপক্ক থেকে যাচ্ছে। আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে অদক্ষ হওয়ার কারণে কুরআন ও হাদীসের মূল অর্থ ও ভাবার্থ উদ্ধারে তারা ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলার নিযামিয়া মাদ্রাসাগুলির এহেন পরিস্থিতির নেপথ্যে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। সেগুলি হল —

(ক) সিলেবাস ঃ বাংলার বাইরে অন্যান্য রাজ্যে পরিচালিত নিযামিয়া মাদ্রাসাগুলির সিলেবাস আমুল পরিবর্তন হলেও বাংলার মাদ্রাসাগুলির সিলেবাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। বাংলার মাদ্রাসাগুলিতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও কমপিউটারের জায়গা হলেও আরবী ভাষা, সাহিত্য এবং ব্যাকরণে নতুন কোনো সংযোজন হয়নি বললেই চলে। ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে সহজে ও কম সময়ে আরবী ভাষা শিখতে পারবে এবং আকীদা ও শরীআহ সহজে বুঝতে পারবে, তা নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়নি এবং করার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করাও হয়নি।

(খ) মাধ্যম ঃ বাংলার ছাত্রদের শিক্ষণ ও শিখনের মাধ্যম একটি বিরাট সমস্যা। বাংলার মাটিতে এখনও উর্দু মাধ্যমেই পাঠদান করা হয়। ফলে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ উভয় দিক থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা চরম সমস্যার সম্মুখীন। ছাত্ররা তো মাতৃভাষাই ভালো করে জানে না, উর্দু বুঝবে কীভাবে? সে ভাষা বুঝবে, না বিষয় বুঝবে? এভাবে ছাত্ররা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতেও পারে না আবার শিক্ষকের ভাষাও বুঝতে পারে না। পরিণামে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাংলা ও উর্দু কোনো ভাষাতেই পারদর্শী হতে পারে না।

(গ) সরকারী ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থাপনা না থাকা ঃ বাংলার বাইরে সমস্ত রাজ্যের প্রায় নিযামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য একটি স্তরে গিয়ে সরকারী পরীক্ষার দেওয়া ব্যবস্থা থাকে। ফলে যারা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে চায়, তারা সরাসরি কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগও পায়। এতে তাদের সময় ও শ্রম কিছুই নষ্ট হয় না। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাপনা না থাকায় মাদ্রাসা পড়ুয়ারা একই সঙ্গে নিযামিয়া ও আলিয়ার সিলেবাস কভার করতে গিয়ে কোনোটাই ভালো করে গ্রহণ করতে পারছে না। ডিগ্রি অর্জিত হলেও যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না।

(ঘ) শিক্ষা পদ্ধতি ঃ কম্পিটিশনের যুগে সমস্ত মিশনারী স্কুলগুলিতে ছাত্রদেরকে ২৪ ঘণ্টা রুটিন মাফিক পরিচালনা করা হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ক্লাস, কোচিং, স্নান, স্বলাত, খেলাধূলা সমস্ত বিষয়ই পরিচালিত হয় নির্ধারিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু নিযামিয়া মাদ্রাসাগুলিতেও এখন ২৪ ঘণ্টার জন্য নির্ধারিত রুটিন নেই। যার ফলে ছাত্রদের মানোন্নয়নও হচ্ছে না।

(ঙ) জায়গীরি ব্যবস্থা ঃ এখনো কোনো কোনো মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ১-৫ কিলোমিটার দূরবর্তী কোনো মসজিদে জায়গীর হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া করে এবং প্রতিদিন মাদ্রাসা যাতায়াত করে। এতে তাদের প্রচুর সময় অতিবাহিত হয় এবং তারা প্রয়োজনে শিক্ষকদের সহায়তাও পায় না। যে সব ছাত্র বিভিন্ন মসজিদে জায়গীর থাকে, তাদেরকে মসজিদের খাদিম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফলে তাদের শিশু বয়সে যে পরিচর্যা পাওয়া প্রয়োজন ছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

উত্তরণের পথ ঃ উল্লিখিত সমস্যাগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলেই সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্‌। মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রদের আবাসিক হিসাবেই রাখতে হবে। জায়গীর প্রথা তুলে দিতে হবে। তাদেরকে ২৪ ঘণ্টা রুটিনমাফিক পরিচালিত করতে হবে। বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী মাদ্রাসাগুলিকে এমন একটি সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ খুব সুন্দরভাবে শেখানো যায় এবং হাদীস, কুরআন, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি শারয়ী বিষয়াদি সম্পর্কেও মৌলিক জ্ঞান দান করা যায়। বাংলা মাধ্যমেই পাঠদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাদের ভাষা হবে সুন্দর। তারা সহজে বাংলা ভাষায় লিখতে ও বলতে পারবে। সাদেসা বা ষষ্ঠ জামাত সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানেই আলেম পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। অষ্টম জামাত অর্থাৎ মাদ্রাসা ফারেগ হওয়ার বছরেই যেন তারা ফাযিল পরীক্ষাও দিতে পারে এবং উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে আগ্রহী ছাত্ররা কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে গিয়েও যেন যথাযথ যোগ্যতার সঙ্গে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। উর্দুকে মাধ্যম হিসাবে নয়, একটি ভাষা হিসাবে পড়াতে হবে।

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

আসুন দ্বীনের প্রকৃত আহ্বায়ক হই

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِیْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیْ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

হে নাবী আপনি বলে দিন আমার ও আমার অনুসারীবৃন্দের পথ হল সজ্ঞানে আল্লাহ্র দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা, আল্লাহ্ পূত পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরাহ্ ইউসুফ, ১০৮)।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

মহান আল্লাহ্ বলেন, হে নাবী আপনি বলে দিন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রেমিক হও তাহলে আমার অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান। আপনি বলুন, ‘আনুগত্য করো আল্লাহ্র এবং রসূলের যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো) নিশ্চয় আল্লাহ্ অমান্যকারীদের ভালোবাসেন না (সূরাহ্ আলি ইমরাণ ৩১-৩২)।

আল্লাহ্র স্পষ্ট ঘোষণা যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের একটাই দায়িত্ব আর তা হল পথহারা দিশেহারা মানুষকে ইসলামের শাশ্বত বিধান সম্পর্কে অবহিত করা। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অবধি এই গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল —

وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ ঃ আপনার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত সমূহ অবতারিত হওয়ার পর (তা প্রচারে) কোনো কিছু যেন প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। তুমি নিজের প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকো, অবশ্যই তুমি অংশীবাদীদের দলভুক্ত হবে না” (সূরাহ্ কাসাস ২৮/৮৭)।

মৌখিক রসূল ভক্তির জন্য নাবী দিবস, ঈদে মীলাদ এবং না'তে রসূলের ছড়াছড়ি। যা করতে গিয়ে ভোগ সর্বস্ব মানসিকতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। দ্বীন হতে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তি ও সমাজকে সত্য কথা বলা যে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ তা দ্বীন প্রেমিকরা বিলক্ষণ জানেন। অরাকাহ বিন নাওফল রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলেছিলেন, ‘‘আপনি যে বাণী এনেছেন তা যেই এনেছে (প্রচার করেছে) তাকে নির্যাতিত হতে হয়েছে” (সহীহুল বুখারী ৪৯৫৩)।

ঝুঁকি নিতে রাজী নয় নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তথাকথিত ভক্ত সকল। মহান আল্লাহ্ বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! অধিকাংশ আলিম ও দরবেশ অবৈধরূপে লোকেদের সম্পদ ভোগ করবে এবং (জনগণকে) আল্লাহ্র পথ হতে বাধা প্রদান করবে (সূরাহ্ তাওবাহ ৯/৩৪)।

বর্তমানে দাওয়াতের নামে যে সমস্ত পেশাদার বক্তামণ্ডলি অর্থোপার্জনের রাস্তা বেছে নিয়েছেন তা আর যাই হোক নাবী মুহাম্মাদের ত্বরীকাহ্ নয়। রকমারী রঙের আলোক রশ্মি দ্বারা সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে উপস্থিত হয়ে শ্রোতাদের মন জয়ের জন্য নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন দ্বীনের অকৃত্রিম অনুসারীদের হতচকিত করে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘ওই ব্যক্তির জন্য সার্বিক ধ্বংস অপেক্ষা করছে যে কথা বলে ও লোকেদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথার অবতারণা করে, ধ্বংস তাদের জন্য, ধ্বংস তাদের জন্য” (হাদীসটি হাসান, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৮৩৪)।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ ওর চাইতে কার কথা উত্তম হবে যে মহান আল্লাহ্র দিকে (লোকেদের) আহ্বান জানাল এবং নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করল এবং ঘোষণা দিল যে সে (আল্লাহ্র বিধানের সামনে)

আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ” (সূরাহ্ হা-মীম সাজদাহ্ বা ফুস্‌সিলাত ৩৩)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন —

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ.

অর্থ ঃ আমার শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের আল্ কুরআন দ্বারা উপদেশ দিন (সূরাহ্ ক্ব-ফ ৪৫)।

এ পর্যন্ত যে কথাগুলি আলোচনাতে এসেছে, তা হল আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে নাবী ও তাঁর অনুসারীদের একমাত্র মিশন। চলতে, ফিরতে, উঠতে , বসতে এবং চাষাবাদ ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে একজন খাঁটি মুসলিম ও নাবীর অনুগামী আল্লাহ্‌র দ্বীনের আহ্বায়ক হবে, এটাই মহান আল্লাহ্‌র বাণীর সারমর্ম। সে কোনো সময় নিজের ও কোনো পার্থিব নেতৃত্বের কথা মানার জন্য লোকেদের বলবেনা। আল্ কুরআন যেহেতু সন্দেহ মুক্ত ও অভ্রান্ত ঐশী দিক নির্দেশনা সেহেতু তদ্বারাই লোকেদের সতর্ক করবে। মানুষের কৌশলের কোনো মূল্য নেই সেজন্য লোকেদের মনোরঞ্জন হেতু অবাস্তব কথা বলা হতে বিরত থাকবে। অবৈধ ভাবে জনগণের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করবে না। দ্বীনের কাজ ও দ্বীন প্রচারে প্রকৃত মজুরীর আশা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই রাখতে হবে। সমস্ত নাবীগণ দাওয়াতের মজুরী জনগণের নিকট কামনা করেন নি বা তাঁদের দুর্ব্যবহারে বিব্রত বোধ করেন নি। কেননা প্রকৃত মজুরী তো তিনিই দিবেন যাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের কথা মানুষকে বলা হচ্ছে।

সঠিক দাওয়াতের কাজে দুঃখ বই সুখ খুবই কম আসে। কেননা হক বিরোধী লোকেরা সর্বদা হকপন্থীদের শত্রুতা করে এসেছে. এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন—

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ ঃ তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করার কথা ভেবে নিয়েছ, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ বিষয়ে সংগ্রামী ব্যক্তিদের এবং তার পরিণতিতে অবাঞ্ছিত অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তিদের মধ্যে ধৈর্যশীলদের প্রত্যক্ষ করছেন (সূরাতু আলি ইমরাণ ৩/১৪২)।

অতএব দুনিয়াবী সুখের লোভে আল্লাহর কথার বিকৃতি সাধন গর্হিত অপরাধ। শরীআতের সিদ্ধনীতি সমূহের কথা যদি দায়ীর বিরুদ্ধেও হয়, তবুও তা আল্লাহ্‌র ভয়ে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ.

অর্থ ঃ (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যদি কষ্টকল্প করে সামান্যও কথা বলেন (যা আমি বলতে বলিনি) তাহলে আমি তাঁর দক্ষিণ হস্তকে ধরব ও তাঁর কণ্ঠনালীকে কেটে দেব। তোমাদের মধ্যে কেউ তা রোধ করতে পারবেনা (সূরাতুল হা-ক্কাহ ৪৪-৪৭)।

যদি নাবী মুহাম্মাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাইরে সামান্যতম কথা বলার অনুমতি না থাকে, তাহলে তথাকথিত দ্বীনের বক্তাগণের জন্য এ অনুমতি এল কোথা হতে? এমন ভেজাল জালসা দ্বারা এক শ্রেণির বক্তাদের দুনিয়া সুন্দর হলেও জনগণের অর্থ ও দ্বীন উভয়ই ক্ষতির শিকার হচ্ছে। সঠিক দ্বীন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জনগণই হচ্ছে এদের অনুসারী। এহেন পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে যাঁরা বোঝেন তাঁদের নীরবতা এদের ব্যবসাভিত্তিক বক্তব্যের বাজারকে আরও বেশি চাঙ্গা হতে সহযোগিতা করছে। দ্বীনের দাওয়াত প্রদান উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার ক্ষমতা ও যোগত্য অনুযায়ী অত্যাবশ্যক। অন্যায় দেখে তা নির্মূলের ভাবনা ও পরিকল্পনা যদি হৃদয়ে না থাকে তাহলে সে হৃদয়কে ঈমান শূন্য বলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন (সহীহ্ মুসলিম ৮০)।

আসুন আমরা সমাজে বাসা বাঁধা অন্যায় সমূহের উচ্ছেদে নিজেকে একজন সমাজসেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করি। আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী জীবন গঠনে এক অন্যের সহায়ক হই। মহান প্রতিপালক, প্রকৃত ঈমান, নির্ভেজাল কর্ম, পারস্পরিক সততার আদান প্রদান এবং ভাল কাজ করতে গিয়ে অপ্রিয় কিছুর বিরোধিতা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলে সহনশীল হওয়া, এই চতুর্গুণের লালনকারী ব্যক্তিকেই লাভবান বলেছেন, অবশিষ্টগণ চিরন্তন ক্ষতির দিকে ধাবমান (সূরাতুল আস্‌র)।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের তিনটি গুণ

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَـةٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ : اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُــهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ اَنْ يُّحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُـحِبُّـهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ.

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যার নিকট এ দুজন ব্যতীত অন্য সকলের চাইতে অধিক প্রিয়, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কোনো মানুষকে ভালবাসে এবং কুফরে ফিরে যেতে সে রকমই অপছন্দ করে যে রকম আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে’’ *(বুখারী ঈমানের সুস্বাদ অধ্যায়, হাদীস নং ১৬; সহীহ্ মুসলিমে সমার্থবোধক হাদীস একটু শব্দের পরিবর্তনের সাথে বর্ণিত হয়েছে - হাদীস নং ৬৭, অধ্যায় - এমন গুণের বর্ণনা যাতে কেউ গুণান্বিত হলে ঈমানের স্বাদ পায়)*।

খাদ্য ও পানীয় যেমন শরীরের খোরাক, তেমনি ঈমান হল আত্মার খোরাক। যেমন খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা হয় জিহ্বা দ্বারা, অনুরূপ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করা হয় হৃদয় দ্বারা। খাদ্য ও পানীয় সুস্বাদু মনে হয় শরীর সুস্থ থাকলে, অনুরূপ আত্মা ঈমানের স্বাদে পরিতৃপ্ত হয় পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্ত থেকে সুস্থ থাকলে। শরীর অসুস্থ হলে মানুষ খাদ্য বস্তুর স্বাদ পায় না বরং কখনো কখনো অধিক অসুস্থতার কারণ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু কিংবা মিষ্টতা নেই এমন বস্তুই স্বাদযুক্ত মনে হয়। যেমন কোনো কোনো অসুখে টক কিংবা ঝাল বস্তুকেই স্বাদযুক্ত মনে হয়। অনুরূপ ভ্রষ্ট কামনা, হারাম বাসনা দ্বারা আত্মা রোগাক্রান্ত হলে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারে না বরং পাপ ও অপরাধমূলক ক্ষতিকর কাজ কর্মই মানুষকে পরিতৃপ্ত মনে হয়।

একজন মানুষ দীর্ঘরোগী বা চিররোগী হলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর বস্তু হতে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠে এবং মাঝে মাঝে ক্ষতিকর বস্তু হতে নিজেকে আয়ত্বে না রাখতে পেরে নিয়ম ভেঙ্গে অস্থায়ী স্বাদ ও সুখ ভোগের জন্য তা ভক্ষণ করে ফেলে। ফলে রোগের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অনুরূপ কারো আত্মায় ঈমানী দুর্বলতাজনিত রোগ স্থায়ী হলে ঈমানের স্বাদ হারিয়ে যাওয়ার ফলে আত্মাকে বিকৃত করার মতো ক্রিয়াকলাপ হতেও বিরত থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ফলে ঈমান বিনষ্টকারী কার্যকলাপে ফেঁসে অস্থায়ী স্বাদ আস্বাদনে মেতে ওঠে এবং কোনো এক সময় চরম অপরাধও ঘটিয়ে ফেলে। সাপের বিষে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেমন নিমপাতা সাধারণ মনে হয়, অনুরূপ ঈমানের দুর্বলতা যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তাহলে বড় বড় অপরাধও কিছুই মনে হয় না।

মানুষ উপরোক্ত বাস্তব পরিস্থিতির শিকার। তাই অশেষ করুণাময় আল্লাহ্, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বিশ্ববাসীর জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরণ করেন (২১/১০৭)। তাঁর দ্বারা মানবাত্মাকে অস্থায়ী আনন্দ উপভোগ থেকে বের করে স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ দানের লক্ষ্যে আত্মাকে সুস্থ রাখতে উপহার দিলেন ঈমান। যা মানুষ পার্থিব জগতে যত কিছুর অধিকারী হয়, সেগুলির সব চাইতে সেরা। এই সর্বোত্তম ও সেরা বস্তু, কে অর্জন করতে পেরেছে আর কে পারেনি, তা নির্ণয় করার বহু সূত্র কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। সেগুলির মধ্যে এ হাদীস শুধু অন্যতমই নয় বরং এমন তুলাদণ্ড যার বাটখারায় ঈমান মাপার পর সফল হলে ঐ ব্যক্তি শুধু সাধারণ ঈমানদারই নয় বরং পার্থিব জগতে ঈমানের মিষ্টতা ও সুস্বাদ উপভোগ করতে থাকে। যার অর্থ হল এমন ব্যক্তি জান্নাতী। তাই ঈমানী যে কোনো আমল এমন ব্যক্তির নিকট সাধারণ। ঈমান ও পার্থিব চাহিদায় সংঘর্ষ হলে, পার্থিব চাহিদা তার নিকট তুচ্ছ। ইসলামের নিয়মনীতি অন্যের নিকট যতই কঠিন মনে হউক না কেন, এ রকম ব্যক্তির নিকট সহজতর। দুনিয়াবী বাধা বিপত্তিকে পাশ কাটিয়ে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি সদা অগ্রসর।

বক্ষমান হাদীসে, মহানাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পার্থিব জগতে ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন লাভের জন্য বাটখারা স্বরূপ তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র তিনটি গুণের কথা উল্লেখিত হলেও এগুলি এমন উচ্চমানের যে, এ

তিনটি গুণ অর্জিত হলে বাকী সকল গুণ স্বাভাবিক ভাবেই অর্জিত হয়ে যাবে। গুণ তিনটি এমন পর্যায়ক্রমিক ও একটি অপরটির পরিপূরক যে, তিনটির মধ্যে কোনো একটি অর্জন করা সম্ভব হলে অপর দুটিও আর অবশিষ্ট থাকবে না, বরং অনায়াসেই প্রবেশ করে একজন মানুষকে পূর্ণমাত্রার ঈমানদার বানিয়ে ফেলবে। গুণ তিনটির প্রতিটি পরস্পরের কারণ কিংবা ফল।

গুণ তিনটি হল —

(১) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যার নিকট অধিক প্রিয় ঃ— একজন প্রেমিকের অপর মেরুর প্রেমিক বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, খ্যাতি, গুণ ও মানে যত উচ্চ, নিখুঁত ও বলিষ্ঠ হবে, প্রেমিকের ভালবাসা ও প্রেম উক্ত প্রেমিকের সাথে ততই দীর্ঘস্থায়ী ও জমকালো ভাবে জমে উঠবে। এখানে যে দুজনের সাথে ভালবাসা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন (১) আল্লাহ্ তাআলা ও (২) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নাম, গুণাবলী, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের উচ্চমানে অতুলনীয়। কাজেই তাঁর সাথে একজন মানুষের প্রেম ও ভালবাসা অন্য কারোর সাথে তুলনীয় হবে এটা খুবই অস্বাভাবিক। বরং স্বাভাবিক এটাই যে, তাঁর সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে, সে সম্পর্ক পৃথিবীর সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা সর্বাধিক হবে।

ভালবাসার দ্বিতীয় পাত্র হলেন নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। তাঁর অবস্থানও গুণ ও মানে পৃথিবীর সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত'' (৬৮/৪)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ''তাঁর (মুহাম্মাদের) চরিত্র ছিল কুরআনের প্রতিলিপি'' (সহীহ্ জামি সাগীর ৪৮১১, মুসনাদ আহমাদ ২৪৬০১)। কাজেই তাঁর সাথেও ভালবাসার সম্পর্ক পৃথিবীর সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা অধিক হতে হবে এটাই দলীল, যুক্তি ও বিবেকের সিদ্ধান্ত।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি আমাদের নিকট থেকে কোনো ধরণের ভালবাসা পাওয়ার মুখাপেক্ষী? নিশ্চয় না। মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে দুর্বল। পরকালীন জীবনে তো বটেই, পার্থিব জীবনেও তার অভাবের সীমা নেই। সে অভাব একমাত্র আল্লাহ্ই পূরণ করতে পারেন। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। কাজেই আল্লাহ্র নিকট থেকে পার্থিব অভাব হোক আর পরকালীন, উভয় অভাব পূরণ সম্ভব তখনই যদি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় পাত্রের ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব হয়।

এখন প্রশ্ন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কোন্ ধরণের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ্ তো অভাবশূণ্য মুখাপেক্ষীহীন (১১২/২)। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বেঁচে থাকলে হয়তো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের ভালবাসার প্রয়োজন বোধ করতেন, কিন্তু তিনিও আজ হতে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাহলে কীভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব? এর উত্তর কুরআনের ভাষায়—আল্লাহ্ বলেন, ''হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো (আমার কথা মেনে চলো, আমার নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করো), আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান'' (৩/৩১)।

উক্ত আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাইলে তাঁর রসূলের নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। এ আয়াত থেকে এটাও স্পষ্ট যে, কারো নিয়মনীতি মেনে যখন উর্দ্ধতনের (আল্লাহ্র) ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব, তখন স্বয়ং তাঁর নিয়মনীতি মেনে তাঁর ভালবাসা অর্জন করা অবশ্যই সম্ভব। এমন কোনো দলীল নেই যে, আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রসূলের ভালবাসা অর্জনের জন্য রসূলের সাথে বা রসূল ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করতে হবে। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি মাত্র (৩/১৪৪)। তাঁর ব্যক্তিগত কোনো চাহিদার জন্য মিশন পরিচালনা করেননি। আল্লাহ্ অভাবশূণ্য হলেও মানুষেরই পরকালে সফলতার জন্য রসূল মারফৎ এক বিশেষ বিধান পালন তলব করেছেন। আর তা প্রতিনিধির অনুসরণের মাধ্যমেই তলব করেছেন। একথার স্বীকারোক্তি দিয়েই আমরা ঈমানে প্রবেশ করি। স্বীকারোক্তি হল —

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন তাঁর বান্দা (আমাদের মতো) ও প্রতিনিধি (মুসলিম ২১)।

আল্লাহ্র নির্দেশ রসূলের অনুসরণ করার জন্য (৩/৩১); আমরা স্বীকারোক্তি দিই রসূলকে প্রতিনিধি বলে, মুআযযিন প্রত্যহ আযানের ডাকে দশবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ দ্বারা

সাক্ষ্য দিয়ে ঘোষণা দেন রসূলকে প্রতিনিধি বলে, ঈমানদার শ্রোতারাও এত নির্ভেজাল ঘোষণা শুনে চুপ থাকতে না পেরে সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করেন; অথচ কার্য ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা নিজেদেরকে, কেউ কোনো নির্দিষ্ট ইমামের নামে জড়িয়ে দিই। পরিতৃপ্ত হই হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বালী, ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়ে। ধন্যবাদ আমাদের ঈমান, ধন্যবাদ আমাদের আল্লাহ্ প্রীতি, ধন্যবাদ আমাদের রসূলের আনুগত্য, ধন্যবাদ আমাদের স্বীকারোক্তি। এ সকল লোকেদেরকে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাউসার জলাধার স্থানে 'দূর হটো, দূর হটো' বলে সরিয়ে দেবেন (বুখারী ৬৫৮৪/৭০৫০)। আবার ইমামের নামের সাথে পরিচিত বা এর বাইরে সকলেই শুধু মুখেই ভালবাসা ও ঈমানের দাবীদার। কার্যক্ষেত্রে একেবারে জিরোর কোঠায়। আল্লাহ্‌র সুমতি প্রার্থনা করি।

(২) ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের দ্বিতীয় গুণটি হল ঃ— একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কোনো মানুষের সাথে ভালবাসা স্থাপন। এ হাদীস ছাড়াও মহানাবী আরো বলেন, সাত প্রকারের লোক কিয়ামাত দিবসে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তন্মধ্যে এক প্রকার লোক হল এমন গুণ বিশিষ্ট যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই একে অপরকে ভালবাসে (বুখারী ৬৬০)। অপর এক হাদীসে রয়েছে — কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ ডাক দিয়ে বলবেন, ''আমার সম্মানার্থে একে অপরের সাথে ভালবাসা স্থাপনকারী লোকেরা কোথায়? আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া নেই, তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দান করব'' (মুসলিম ২৫৬৬)।

এমন ব্যক্তি ঈমানী স্বাদে পরিতৃপ্ত হয়, যে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই কোনো মানুষকে ভালবাসে এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। কোনো মানুষকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অর্থ হল — ঐ ব্যক্তির ঈমান, আমল, আচরণ দেখে তাঁকে পছন্দ হবে এবং পার্থিব কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয় বরং তাঁর ঈমানী চরিত্রের জন্যই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হবে।

আমরা আমাদের পার্থিব নিয়মেও দেখি - কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন তখনই পূর্ণমাত্রা পায় যখন তার প্রিয় পাত্রের সাথেও ভালবাসার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এমনটি অস্বাভাবিক যে আমরা কাউকে ভালবাসি, আর তার প্রিয় পাত্রকে ঘৃণা করি। একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। কাজেই তার সাথে অপর একজন ঈমানদার, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এ রকম হলে উভয়েই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে (ইন্‌শা-আল্লাহ্)।

(৩) ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের তৃতীয় গুণটি হল ঃ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন অপছন্দ করা হয় অনুরূপ অপছন্দ করা হবে কুফরে ফিরে যেতে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালবাসার প্রতীক হল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা হবে এবং যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা হবে। এভাবে যখন কোনো মানুষের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হবে, এর স্বাদ আস্বাদন করবে। ঈমান স্বাভাবিক ভাবেই পছন্দনীয় মনে হবে ও তার উপর স্থায়ী রূপে অটল থাকাও পছন্দনীয় মনে হবে। ফলস্বরূপ ঈমান বৃদ্ধিকরণও পছন্দনীয় মনে হবে। এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অপছন্দ হবে। এ অপছন্দ এমন হবে যেমন কেউ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে। ঈমান থেকে বের হওয়া ও আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া দুই সম পরিমাণ অপছন্দ একত্রে হলে এ রকম গুণের অধিকারী একজন মুমিন প্রাণ সম্পদ বিলীন করে দিতে সহাস্য বদনে প্রস্তুত, তবু ঈমানী সম্পদে আঁচড় লাগতে দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ ঈমান হারালে শূন্যস্থান পূরণ করা হবে জাহান্নাম দিয়ে। অপর দিকে হারানো প্রাণের শূন্যস্থান পূরণ হবে সেই স্বীয় প্রাণ ও জান্নাত দিয়ে। ঈমান রক্ষার্থে ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম), উখদূদ ওয়ালা, বেলাল (রাঃ) ও খুবাইব (রাঃ) রা হোন ঈমান ওয়ালাদের আদর্শ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনের প্রাণ ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন (৯/১১১)। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে পছন্দনীয় করে পেশ করেছেন, এ ঈমানকে তোমাদের অন্তরে সুন্দর করে স্থাপন করেছেন এবং তোমাদের নিকট কুফ্‌র, ফিস্‌ক ও অবাধ্যতা অপছন্দনীয়ভাবে পেশ করেছেন; এ সকল লোকেরাই সুপথ প্রাপ্ত (৭/৪৯)।'' মহানাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন— لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَ حُرِّقْتَ

আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করো না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করা হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (মিশকাত ৫৮, তাহক্বীক ইবনু মাজাহ্ আলবানী ৪০৩৪, হাদীস হাসান)।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, ''হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরে ঈমান প্রীতি দাও, সেটিকে সুন্দর করে অন্তরে স্থাপন করো, কুফ্‌র, ফিস্‌ক ও অবাধ্যতাকে আমাদের অপছন্দ করো এবং আমাদেরকে হক পথের পথিক বানাও'' (সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ আলবানী ৬৯৯)।

৫০ পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلَاةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

وَ لَا يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبِ حَرِيْرٍ وَ لَا ثَوْبِ شُهْرَةٍ وَ لَا مَغْصُوْبٍ.	রেশম❶ সোনা ❷এবং ছিনতাই করা❸কাপড়ে যেন স্বলাত না পড়ে।

❶ যেহেতু পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান করা হারাম, তাই এ রকম পোশাক পরে স্বলাত সম্পাদন করাও নিষিদ্ধ। এই পোশাকের হারাম হওয়ার দলীল নীচে বর্ণিত হল —

(ক) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ.

তোমরা রেশম পরিধান করো না, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যে রেশম পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।[১]

(খ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ.

পৃথিবীতে কেবল সেই ব্যক্তিই রেশম পরিধান করে, যার আখেরাতে কোনো অংশ নেই।[২]

(গ) আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

اُحِلَّ الذَّهَبُ وَ الْحَرِيْرُ لِلْاِنَاثِ مِنْ اُمَّتِيْ وَ حُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا

সোনা এবং রেশম আমার উম্মাতের মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৩]

এ সমস্ত দলীল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা হারাম।

১৭০ ঃ চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম পরা বৈধ

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا مَوْضَعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ.

১। বুখারী ৫৮৩০, ৫৮৩৪, কিতাবুল লেবাস ঃ বাবু লুবসিল হারীর অফ্‌তিরাশিহি লির্ রিজালি .... মুসলিম ৬০৬৯, আহমাদ ১/২০, নাসায়ী ৮/২০০।

২। বুখারী ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৫৯।

৩। সহীহ্ সহীহ্ তিরমিযী ১৪০৪, কিতাবুল লেবাস ঃ বাবু মা জাআ ফিল হারীরে অয্ যাহাব, তিরমিযী ১৭২০, আহমাদ ৪/৩৯২, নাসায়ী ৮/১৬১, বাইহাক্বী ২/৪৩৫।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রেশম পরতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই বা তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ পরলে তা স্বতন্ত্র বিষয়।[১]

১৭১ঃ রেশমের উপর বসাও নিষিদ্ধ

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَ الدِّيْبَاجِ وَ اَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রেশম পরতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[২]

(জমহুর) - এই হাদীসের কারণে রেশমের উপর বসা হারাম।[৩]

এ মসলাতে উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছেযে রেশম হারাম হওয়া সত্বেও কি তা পরিধান করে সম্পাদিত স্বলাত যথেষ্ট হবে বা হবে না ?

(জমহুর) - যদিও এ কাপড় পরা হারাম তথাপি স্বলাত হয়ে যাবে।

(মালেক রহঃ)- এ রকম লোক স্বলাতের সময়ে দ্বিতীয়বার স্বলাত আদায় করবে।[৪]

(রাজেহ) - যদি কেউ সাধারণভাবে রেশম পরাকে হারাম করে দেন, তাহলে স্বলাতের জন্যও পরিধান করা হারাম। কেননা সে এমন পোশাক পরে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে প্রবেশ করছে যাকে সে হারাম হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। তবুও কি তার স্বলাত বাতিল হয়ে যাবে ? বাতিল হওয়ার জন্য স্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন (আর এরকম দলীল আমাদের জানা নেই)।[৫]

❷ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِىْ الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مُذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামাতের দিন অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন ।[৬]

খ্যাতির লেবাস বলতে এমন কাপড় বা পোশাককে বোঝায় যা সাধারণ মানুষের পোশাকের রঙের থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তার দিকেই দৃষ্টিপাত করে এবং সেই ব্যক্তি অহংকার প্রকাশ করে আর নিজেকে গৌরাবান্বিত মনে করে .....। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্যাতির লেবাস পরিধান করা হারাম। মনে রাখতে হবে যে, এ হাদীস কেবলমাত্র উত্তম পোশাকের সঙ্গেই নির্দিষ্ট নয় বরং এ অহংকার খ্যাতির লেবাস তো এমন লোকেরও হতে পারে যে, ফকির ও মিসকীনদের লেবাসের বিপরীত পোশাক পরিধান এই নিয়্যাতে যে, মানুষ তাকে দেখবে এবং তার পোশাক দেখে হতবাক হবে।[৭]

১। বুখারী ৫৮২৮, ৫৮২৯, ৫৮৩০, কিতাবুল লিবাস বাবু লুবসিল হারীরে অফতিরাশিহি ..... মুসলিম ২০৬৯, আবূ দাউদ ৪০৪২, নাসায়ী ২০২৩৮, ইবনু মাজাহ্ ৩৫৯৩, আহমাদ ১/১৫।

২। বুখারী ৫৮৩৭, কিতাবুল লিবাস ঃ বাবু ইফতিরাশিল হারীর।

৩। ফাত্হুল বারী ১১/৪৭২, আল উম্ম ১/১৮৫, হিলইয়াতুল উলামা ফী মারেফাতে মাযাহেবিল ফুকাহা ২/৬৭, আল্ জামেউস সাগীর ৪৭৬, আল খারাশী ১/২৪৫, আল ইনসাফ ফী মারেফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ১/৪৭৫।

৪। নাইলুল আওতার ১/৫৫৬, ফাত্হুল বারী ২/৩৮।

৫। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৬৩।

৬। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩৩৯৯, কিতাবুল লিবাস ঃ বাবুন ফী লুবসিশ শুহরা, আবূ দাউদ ৪০২৯, আহমাদ ২/১৩৯, ইবনু মাজাহ্ ৩৬০৭।

৭। নাইলুল আওতার ১/৫৯৬)।

❸(ছিনিয়ে নেওয়া পোশাকেও স্বলাত পড়া যাবে না) কেননা এ পোশাক অন্যের এবং সকলের ঐক্যমতে হারাম[১] কিন্তু যদি কেউ এ ধরণের কাপড়ে স্বলাত আদায় করে নেয়, তাহলে কি তার স্বলাত সহীহ্ হবে, না হবে না?

ইমাম শওকানী বলেছেন, ''এমন কাপড়ে স্বলাত সহীহ্ হবে না - এমন সিদ্ধান্তের জন্য সহীহ দলীলের প্রয়োজন''।[২]

(আবূ হানীফা, শাফেয়ী রহঃ) — এমন পোশাকে স্বলাত সহীহ্।[৩]

রাজেহ ঃ এ রকম লোক ছিনতাই এর জন্য গুনাহগার হবে কিন্তু তার স্বলাতও সঠিক হবে না? এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট দলীল আমাদের জানা নেই। অবশ্য যদি তার নিকটে সতর ঢাকার জন্য ছিনতাই করা কাপড় ব্যতীত অন্য কোনো কাপড় বা গাছ না থাকে, এই রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তাআলা অন্যের মাল ব্যবহার করা হালাল করেছেন।[৪]

১৭২ ঃ হলুদ রঙে রঞ্জিত পোশাক পরা নিষিদ্ধ

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার উপরে দুটি হলুদ রঙের কাপড় দেখে বললেন — اِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبِسُهَا.

নিশ্চয় এটি কাফিরদের পোশাক, তাই তুমি তা পরিধান কর না।[৫]

এই ধরণের পোশাক স্বলাতে পরিধান করা আরো বেশি নিষিদ্ধ। প্রকাশ থাকে যে, মুআসফার এমন কাপড়কে বলা হয়, যা একটি সুনির্দিষ্ট হলুদ রঙের বুটি দিয়ে রঙ করা হয়।

তাকে কিবলামুখী হতে হবে যদি সে কাবাকে দেখতে পায় অথবা দেখার হুকুমে থাকে❶।	**وَ عَلَيْهِ اِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ اِنْ كَانَ مُشَاهِدًا لَهَا اَوْ فِىْ حُكْمِ الْمُشَاهِدِ.**

১ (ক) আল্লাহ্ তাআলা বলেন — وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقره : ١٤٤)

অর্থ ঃ তুমি যেখানেই থাক মাসজিদুল হারামের দিকে মুখমণ্ডলকে ফিরিয়ে নাও।

(খ) আল্লাহ্র রসূল যখন স্বলাতে দাঁড়াতেন, তখন ফরয এবং নফল উভয় স্বলাতে কিবলামুখী হতেন এবং এর আদেশও করতেন। অতএব নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মুসীউল স্বলাত বা ভুল পদ্ধতিতে স্বলাত সম্পাদনকারীকে বলেন —

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

যখন তুমি স্বলাতের ইচ্ছা করবে, তখন সম্পূর্ণ অযু কর এবং কিবলামুখী হয়ে তাকবীর দাও।[৬]

(গ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার লোকেরা মাসজিদে কুবাতে ফজরের স্বলাত পড়ছিলেন।

১। আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যা ২৩৪৩১।

২। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৬৩।

৩। নাইলুল আওতার ১/৫৫৩।

৪। আল্ মুগনী লে ইবনে কুদামা ২/৩১৬, আস্ সাইলুল জাররার ১/১৬৪।

৫। মুসলিম ২০৭৭, কিতাবুল লিবাস অয যীনাহ ঃ বাবুন নাহিয়ে আন লুবসির রাজুলে আস্ সাওবাল মুআসফার, আহমাদ ২/১৬২, নাসায়ী ৮/২০৩।

৬। বুখারী ৬২৫১, কিতাবুল ইস্তিযান ঃ বাবু মান রাদ্দা ফাকালা আলাইকাস সালাম, মুসলিম ৩৯৭, নাসায়ী ৩/৫৯, আবূ দাউদ ৮৫৬, তিরমিযী ৩০৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৬০।

হঠাৎ একজন লোক এসে বলল ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। وَ قَدْ أُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ. এবং তাঁকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিবলামুখী হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডল শাম দেশের দিকে ছিল এবং তিনি কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।[১]

উল্লিখিত সমস্ত দলীল থেকে বোঝা যায় যে, স্বলাত সম্পাদনকারীর জন্য কিবলামুখী হওয়া ফরয এবং এর উপর মুসলিমদের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে।[২]

০ দুই অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া ফরয হয় না ০

১। যুদ্ধ চলাকালীন সময় ভীষণ ভয়ের সময় যখন কিবলামুখী হয়ে স্বলাত সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا (البقره : ٢٣٩)

যদি তোমরা ভয় পাও, তাহলে পায়ে হেঁটে বা সওয়ারী হয়ে (সর্বাবস্থায় স্বলাত পড়তে হবে)।

এই রকমই অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে ঃ নাফে বলেন যে, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ভয়ের সময় স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি তার পদ্ধতি বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন, ‘‘যদি ভয় এর থেকে আরো বেশি ভয়ংকর হয়, তাহলে

صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ اَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ وَ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا.

পদাতিক সেনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারীর উপর থেকে কিবলামুখী হয়ে বা কিবলামুখী না হয়ে স্বলাত পড়বে। - নাফে (রহঃ) বলেন যে, আমার জানা মতে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথাই বর্ণনা করেছেন।[৩]

২। সওয়ারীর উপর নফল স্বলাত ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের সওয়ারীর উপর — قَبْلَ اَیِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ.

যে দিকেই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মুখ হত, নফল স্বলাত পড়তেন এবং তার উপর বেতরের স্বলাতও পড়তেন কিন্তু ফরয স্বলাত সওয়ারীর উপর পড়তেন না।[৪]

অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে — حيثما توجهت به

অর্থাৎ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাহন যেদিকে তাঁর মুখ করে দিতেন (স্বলাত পড়তেন)।[৫]

১। বুখারী ৪০৩, ৪৪৮৮, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু মা জাআ ফিল কিবলাতে অ মাললাম ইয়ারাল ইআদাতা আলামান সাহা, মুসলিম ৫২৬, মুআত্তা ১/১৯৫, আহমাদ ২/১৬, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১, নাসায়ী ২/৬১, দারেমী ১/২৮১, ইবনু আবী শাইবা ১/৩৩৫।

২। নাইলুল আওতার ১/২৭৭, আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/২৩৫।

৩। বুখারী ৯৪৩, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবু স্বলাতিল খওফ রিজালান অ রুকবানা মুসলিম ৩০৬, নাসায়ী ৩/১৭৩, আহমাদ ২/১৫৫, আবূ আওয়ানাহ্ ২/৩৫৮, দারাকুতনী ২/৫৯, বাইহাক্বী ৩/২৬০।

৪। বুখারী ৯৯৯, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবুল বিতরে আলাদ দাব্বাহ্, মুসলিম ৩৬, আবূ দাউদ ১২২৪, তিরমিযী ৪৭২, নাসায়ী ৩/২৪২, ইবনু মাজাহ্ ১২০০, আহমাদ ২/৭।

৫। আহমাদ ২/৭, মুসলিম ৭০০, তিরমিযী ৪৭২।

মনে রাখতে হবে যে, উল্লিখিত দুই অবস্থাতেও (সাধ্যমত) তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার সময় কিবলামুখী হওয়া ওয়াজেব।[১] যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সফরে নফল স্বলাত পড়ার ইচ্ছা করলে — اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ

তিনি নিজের বাহন উষ্ট্রীর সঙ্গে কিবলামুখী হতেন এবং তাকবীর বলতেন।

ثُمَّ صَلّٰى حَيْثُ وَجَّهَهُ رُكْبَانَهُ

অতঃপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সওয়ারী যেদিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে দিতেন (স্বলাত পড়ে নিতেন)।[২]

যদি কেউ বলে যে, এ হাদীসে তো কেবল নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ফেল বা কর্ম (অর্থাৎ নফল স্বলাতে কিবলামুখী হওয়া) বর্ণিত হয়েছে এবং এর উসূল বা নিয়ম হল এই যে, ফেল বা কর্ম দ্বারা ওয়াজেব প্রমাণিত হয় না। এর জবাব হল এই যে, এ হাদীস ওয়াজেব প্রমাণিত করার জন্য নয় বরং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ কর্মকে স্পষ্ট করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ওয়াজেবের দলীল তো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

কিছু কিছু মানুষের ধারণা হল এই যে, কিবলামুখী হওয়া স্বলাতের শর্ত। যেমন ইমাম ইবনু কুদামা হাম্বেলী লিখেছেন —

اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ فِىْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِلَّا فِىْ حَالَتَيْنِ.

দুই অবস্থা ব্যতীত স্বলাতের বিশুদ্ধতার জন্য কিবলামুখী হওয়া স্বলাতের জন্য শর্ত।[৩]

কিন্তু তাঁর নিকটে এমন কোনো দলীল নেই, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিবলামুখী না হলে স্বলাত শুদ্ধ হবে না। কেবল সেই দলীলগুলিই রয়েছে, যেগুলিতে কিবলামুখী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং খুবই পরিচিত কথা হল এই যে, হুকুম বা নির্দেশ থেকে ওয়াজেব প্রমাণিত হয়, শর্ত নয়। কেননা নির্দেশাবলী এবং ফরযসমূহ আহকামে তাকলীফিয়্যাহ বা বাধ্যতামূলক নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত আর শর্ত হল আহকামে অযইয়্যাহ বা গঠনমূলক নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত।[৪]

যদি কিবলা দেখা না যায়, তাহলে চেষ্টা ও অনুসন্ধান করে সেই দিকেই মুখ করতে হবে ❶।	وَ غَيْرُ الْمُشَاهِدِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ التَّحَرِّىْ

❶ (ক) কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦) আল্লাহ্ তাআলা কোনো আত্মাকে সাধ্যের বেশি বাধ্য করেন না।

(খ) আব্দুল্লাহ্ বিন আমের বিন রাবিয়া (রহঃ) নিজের পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘‘আমরা এক অন্ধকার রাতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সফরে ছিলাম। কিবলা সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না।

فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلٰى حِيَالِهِ তাই আমাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের দিকে স্বলাত পড়ে নিল। সকাল

পরবর্তী অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

১। আল্ মুগনী লে ইবনে কুদামা ২/৯৩, নাইলুল আওতার ১/৬৮৫।

২। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ১০৮৪, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবুত তাতাউয়ে আলার রাহেলা, আবূ দাউদ ১২২৫, আহমাদ ৩/২০৩, বাইহাক্বী ২/৫, ইমাম নওয়াবী (রহঃ) এর সানাদকে হাসান বলেছেন - আল্ মাজমূ ৩/৩১৫।

৩। আল্ মুগনী লি ইবনে কুদামা ২/৯২।

৪। ইরশাদুল ফহুল ১/১৫, আল্ ইহকাম লিল্ আযাদী ১/৯০।

১ম পর্ব

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যা হজ্জ উমরাহ্তে মহিলাদের করণীয় ও হজ্জ উমরাহ্ সংক্রান্ত মহিলাদের জন্য ত্রিশটি বিশেষ উপদেশ

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বা'য, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু স্বলিহ আল্ উসাইমীন, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন জিবরীন (রহঃ) ও ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্

ভাষান্তর ঃ উবাইদুর রহমান বিন আব্দুল মান্নান

মাহরামবিহীন মহিলার হজ্জ

প্রশ্ন ঃ কোন মুসলিম মহিলার জন্য বিশ্বস্ত মহিলাদের সাথে ফরয হজ্জ আদায়ের বিধান কী? যদি তার কোনো মাহরাম অভিভাবক না থাকে? ফরয হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে 'মা' কি তার অভিভাবক হতে পারে? বা খালা, ফুফুদের সাথে হজ্জ করতে পারেন? না তিনি হজ্জের জন্য কোনো পুরুষ ব্যক্তিকে মাহরাম বানিয়ে নেবেন?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, মহিলাগণ কেবলমাত্র স্বামী অথবা কোনো পুরুষ মাহরাম ব্যক্তির সাথেই হজ্জ বা উমরার সফর করবেন। কোনো বিশ্বস্ত মহিলার সাথে বা বিশ্বস্ত গাইর মাহরাম পুরুষের সাথে হজ্জ বা উমরার সফরে যাওয়া কোনো মহিলার জন্য বৈধ নয় এবং মা, খালা, ফুফুদের সাথে সফর করাও বৈধ নয়। বরং তার সাথে স্বামী বা কোনো পুরুষ মাহরাম থাকা অত্যন্ত জরুরী। যতক্ষণ তিনি কোনো পুরুষ মাহরাম বা স্বামী না পান ততক্ষণ তাঁর উপর হজ্জ ফরয নয়। শারয়ী ক্ষমতা না থাকার কারণে হজ্জ অজিব থাকেনা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

আর আল্লাহ্ তাআলার জন্য এ ঘরের হজ্জ করা হল মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য, যে লোকের সামর্থ বা ক্ষমতা রয়েছে সে পর্যন্ত পৌঁছানোর (সূরাহ্ আল্ ইমরান ৩/৯৭) (ফাতাওয়া লাজনাতুদ্ দায়িমাহ্)।

ঋতুবতী মহিলার বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় বাধা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ আমি উমরাহ্ যাত্রী মহিলা ঋতু বা হায়েয হওয়ার কারণে ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করি অতঃপর পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করি ও মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধি। এটা কী জায়েয

উত্তর ঃ এমন করা জায়েয নয়। উমরাহ্ বা হজ্জের নিয়াতকারী কোনো মহিলার জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা বৈধ নয়, যদিও তিনি ঋতুবতী হন। হায়েয ও নিফাস অবস্থাতেও ইহরাম বাধা বৈধ ও সঠিক কাজ। এর দলীল হল আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সন্তান প্রসব করেন সেই সময় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য যুলহুলাইফায় অবতরণ করেন, তখন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর করণীয় সম্বন্ধে জানতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট লোক পাঠান। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উত্তরে বলেন — اِغْتَسِلِىْ وَ اسْتَشْفِرِىْ بِثُوْبٍ وَ أَحْرِمِىْ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধো এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো (বুখারী ১৫৫৭, মুসলিম ১২১৮, ইবনু মাজাহ্ ২৯৮২)।

হায়েযের বিধান নিফাস (সন্তান প্রসবের রক্ত) এর মতই। আমি মহিলাদের একথাই বলব যে, কোনো মহিলা হায়েয অবস্থায় হজ্জ বা উমরার জন্য মীকাত অতিক্রম করলে তিনি যেন গোসল করে ভালোভাবে কাপড় শক্ত করে বেঁধে রাখেন এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করেন।

استثفار শব্দের অর্থ শক্ত করে কাপড়ের টুকরো লজ্জাস্থানে বেঁধে নেওয়া এবং তা জড়িয়ে রাখা। অতঃপর হজ্জ বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবেন। কিন্তু মক্কা পৌঁছে কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন না ও তাওয়াফ করবেন না। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উমরাহ্ করতে এসে ঋতুবতী হয়ে পড়লে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে বলেন —

اِفْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِىْ.

পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও (বুখারী ১৬১৩, মুসলিম ১২১১, ইবনে হিব্বান ৩৮৩৫)।

সহীহুল বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, তিনি যখন পবিত্র হবেন তখন বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো মহিলা যদি হায়েয অবস্থায় হজ্জ বা উমরার ইহরাম করেন, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ ও সায়ী করবেন না। অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ, সায়ী করে গোসল করবেন। কিন্তু কোনো মহিলার যদি তাওয়াফপূর্ণ হওয়ার পর মাসিক শুরু হয় তাহলে তিনি সায়ী করে নিবেন যদিও হায়েয বিদ্যমান থাকে এবং চুল কেটে উমরাহ্ সমাপ্ত করবেন। কেননা সাফা-মারওয়া সায়ী করার জন্য পাক-পবিত্র হওয়া শর্ত নয় (শাইখ ইবনু উসাইমীন)।

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় খোপা বাঁধা ও দস্তানা পরার বিধান কী? যে পোষাকে ইহরাম বাঁধেন তা খোলা কী বৈধ?

উত্তর ঃ চুল বেঁধে ও জুতো পরে মহিলাদের ইহরাম বাঁধা উত্তম এতে তাদের জন্য পর্দা রক্ষায় উত্তম পন্থা। যদি তাদের একাধিক পোষাক থাকে তবে তাদের জন্য তা বৈধ।

যদি কোনো মহিলা চুল বেঁধে ইহরাম করে এবং পরে তা খুলে দেয় তাতে কোনো দোষ নেই। যেমন পুরুষ মুহরাম ব্যক্তি তাঁর পরিহিত পোষাক বদল করে থাকেন ও তাঁর জুতো খুলে ফেলায় তার কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু কোনো মহিলা দস্তানা পরে ইহরাম করতে পারেন না, অনুরূপ ইহরাম অবস্থায় দস্তানা ব্যবহার করতে পারেন না। কেননা মুহরিম মহিলার জন্য দস্তানা (হাত মোজা) পরা নিষিদ্ধ। অনুরূপ মহিলাদের নিকাব (মুখাবরণ) পরিধানের বিধান একই। সুতরাং বোরকা বা ঐ ধরণের পোষাক বা চাদর নিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকবেন না। কেননা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। কিন্তু কোনো পরপুরুষ বা গাইর মাহরাম পুরুষের বর্তমানে ওড়না বা চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নিতে হবে। তাওয়াফ ও সায়ীর সময়ের বিধান একই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَ نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا حَاذُّوْابِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبًا بَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ (ابو داؤد و ابن ماجه)

আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ''অনেক কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। তারা আমাদের সামনা-সামনি আসলে আমাদের নারীরা নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নিত। অতঃপর তারা অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা মুখ খুলতাম'' (আবূ দাউদ ১৮২১, শাইখ ইবনু বায রহঃ)।

দুর্বল মহিলাদের মুযদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে অগ্রিম প্রস্থানের বিধান

প্রশ্ন ঃ চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর মহিলাদের দুর্বলতার জন্য মুযদালিফা হতে দ্রুত অগ্রিম এসে (শয়তানকে) পাথর মারার বিধান কী?

উত্তর ঃ মহিলাদের দুর্বলতার জন্য চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর জামরাকে পাথর মারার জন্য মুযদালিফা হতে দ্রুত অগ্রিম চলে আসা মহিলাদের জন্য বৈধ রয়েছে ভীড়ের কারণে মহিলাদের আগে ভাগে মিনা আসা জায়েয।

মুগনী গ্রন্থে একই কথা বলা হয়েছে। দুর্বল ও বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলাদের আগে আগে চলে আসায় কোনো দোষ নেই। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর স্ত্রী ও আয়েশা (রাযিাল্লাহু আনহা) কে আগেই নিয়ে চলে আসতেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী আত্বা, সাওরী, শাফেয়ী ও আবূ সাওর প্রমুখ বিদ্যানগণ একই কথা বলেছেন। আহ্লে রায়দের কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে আমি জানিনা। কেননা এতেই ভীড়ের কষ্ট হতে বাঁচার সুকৌশল ও সহজ উপায় রয়েছে ও সেইসাথে রয়েছে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আনুগত্য।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) তাঁর 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলেন, এ সমস্ত দলীল প্রমাণ করে যে, রামীয়ে জামারের (শয়তানকে পাথর মারার) সাধারণ সময় হল সূর্য ওঠার পর আগে নয়। কিন্তু দুর্বল, বৃদ্ধ ও নারীদের জন্য বিশেষ ছাড় হল সূর্য ওঠার পূর্বেই বৈধ বা জায়েয রয়েছে।

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজমুআ-ই-ফাতাওয়া' ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও তাঁর সাথীগণ বলেন, ''নারীগণ, বৃদ্ধ ব্যক্তি ও শারীরিক দুর্বল ব্যক্তিগণের মধ্য রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফা হতে মিনা আসা সুন্নাহ্। যাতে মানুষের ভীড়ের আগেই জামরা-ই আক্বাবাহ্কে কাঁকর মারতে পারেন। অতঃপর এ বিষয়ে হাদীস দিয়ে দলীল উল্লেখ করেন (শাইখ ইবনু স্বলেহ আল্ ফাওযান)।

হজ্জ ও উমরায় মহিলাদের মাথা মুণ্ডন সম্বন্ধে

প্রশ্ন ঃ হজ্জ ও উমরায় মহিলাদের মাথা মুণ্ডন (ন্যাড়া) করা কী জায়েয?

উত্তর ঃ হজ্জ বা উমরায় মহিলাগণ মাথার চুল সামান্য ছাঁটবেন। যা মাত্র এক আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো বা ন্যাড়া করা জায়েয নয়। أنملة শব্দের অর্থ আঙ্গুলের অগ্রভাগ অর্থাৎ এক গিরা বা গাঁট।

আল্ মুগনী কিতাবের গ্রন্থাকার বলেন, ''মহিলাদের জন্য চুল সামান্য পরিমাণ ছাঁটা জায়েয ন্যাড়া মুন্ডানো জায়েয নয়। এ বিষয়ে কোনো আলিমের দ্বিমত নাই।''

ইবনু মুনযির বলেন, ''এ বিষয়ে বিদ্যানগণের ইজমা রয়েছে।'' কেননা মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করা 'মুসলার' ন্যায়।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন —

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ - ابو داؤد.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মহিলাদের জন্য হালক্ব অর্থাৎ ন্যাড়া করা জায়েয নয়, তাদের কেবলমাত্র তাকসীর বা ছোট করা জায়েয (আবূ দাউদ)।

عن علی قال : نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة راسها. المجموع

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করতে নিষেধ করেছেন.।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, ''প্রত্যেক যুগের আলিমগণ আঙ্গুলের অগ্রভাগ সম পরিমাণ চুল ছোট করার কথা বলেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক ও আবূ সাওর (রহঃ) গণের একই কথা।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদের নিকট আমি মহিলাদের তাকসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি। উত্তরে তিনি বলেন, সমস্ত চুল একত্রিত করে চুলের ডগা বা অগ্রভাগ আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ কেটে নিবে।

ইমাম নববী (রহঃ) المجموع কিতাবের মধ্যে বলেন, 'উলামাগণের ইজমা রয়েছে যে মহিলাদের হালক্ব করতে আদেশ দেওয়া হয়নি বরং তাদের কর্তব্য হল চুল ছোট করা। কেননা হালক্ব বা ন্যাড়া করা তাদের বিদআত ও মুসলা সাদৃশ্য বা শাস্তি স্বরূপ (শাইখ স্বলেহ আল্ ফাওযান)।

হজ্জের নিয়ম পালনার্থে মহিলাদের নির্দিষ্ট পোশাক

প্রশ্ন ঃ হজ্জ পালনের জন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো বিশেষ রঙের বা বিশেষ পোশাক পরা কী জরুরী?

উত্তর ঃ হজ্জ পালনের সময় মহিলাদের পরার জন্য কোনো প্রকার নির্দিষ্ট পোশাক নাই। মহিলাগণ তাদের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ এমন পোশাক পরিধান করবেন যা তাদের শরীরকে আবৃত করে যাতে কোনো প্রকার নকসা থাকবেনা বা পুরুষের সাদৃশ্য হবেনা। মুহরিম মহিলাদের বোরকা পরা বা সেলাই করা এমন পোষাক যাতে মুখমণ্ডল খোলা থাকে এবং সেই সাথে কোন প্রকার দস্তানা পরবেন না। বোরকা ছাড়া মুখমণ্ডল ঢাকা ও দস্তানা ছাড়া হস্তদ্বয় ঢাকা অজিব। কেননা উভয় অঙ্গ পর্দার অন্তর্ভুক্ত যা আবৃত করা অজিব। ইহরাম অবস্থায় উক্ত অঙ্গ দুটি আবৃত করা বা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ নয় বরং তা কেবলমাত্র বোরকা ও দস্তানা দিয়ে ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে (শাইখ স্বলেহ আল্ ফাওযান)।

দ্বীনি মাদ্রাসার শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ ঃ কিছু ভাববার কথা

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহসিন আনজুম

দ্বীন ও মিল্লাতের সর্বাঙ্গীন সুস্থতা ও ক্রমোন্নতির জন্য দ্বীনী তালিম ও তারবীয়ত যে একান্তভাবেই অপরিহার্য তথা এই অত্যন্ত জরুরী কাজটিকে দেশ দুনিয়ার খাঁটি ইসলামী মাদ্রাসাসমূহ যুগ-যুগান্ত ধরে সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে চলেছে — একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবিভক্ত ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশকালেই নিয়মাধীন দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুভ কাজটির সূত্রপাত ঘটে। স্বাধীনোত্তর কালের হীনমন্যতাগ্রস্ত মুসলিম সমাজ নানা আশংকা ও অসুবিধা সত্বেও নতুন নতুন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দুঃসাহসিক ধারাটিকে অদ্যাবধি অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে, এটাও আল্লাহ্ তাআলারই অশেষ দয়া রহমতের অন্যতম নিদর্শন। বিগত কিছু কাল হতে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ অমুসলিম সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্রাংশ অকারণ হিংসা বিদ্বেষবশতঃ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মন-গড়া গভীর ষড়যন্ত্র এঁটে চলেছে একের পর এক। সরকার ও প্রশাসনের একাংশও মাঝে মধ্যে মিথ্যা মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে বেকসুর দ্বীনী মাদ্রাসায় নানারূপ হয়রানিমূলক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহরই রহমতে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনো অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত বিষয়াদি আবিস্কৃত হয়নি, তবুও এক শ্রেণির ঘোর ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী তত্ত্ব তার স্বভাবসুলভ মন্দ আচরণ অনুযায়ী নিত্য নতুন মনগড়া ষড়যন্ত্র রচনার ধারা অব্যাহতই রেখেছে। এই শ্রেণির প্রকাশ্য দুশমনরা সদা-সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট সরকার ও প্রশাসনকে মনগড়া ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট থাকে। এমনকী এরা আরবী-ফার্সি ভাষায় উত্তেজক ব্যানার পোষ্টার বানিয়ে ইসলাম ও মুসলিমকে অহেতুক বদনাম করতে, তথা স্বসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বেশি বেশি সমর্থন হাসিল করার গভীর ষড়যন্ত্র করতেও লজ্জাবোধ করেনা। দেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধাতেও এই শ্রেণিরই লোকদের ভূমিকা হরহামেশা অগ্রগণ্য। দেশের অধিকাংশ শান্তিপ্রিয় মানুষদের আশু কর্তব্য হচ্ছে, এদের দুশ্চরিত্রা সম্পর্কে অবগত থাকা তথা এদের সক্রিয়তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একালে এ একটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ কাজে জান-মাল-ইজ্জতের ঝুঁকি প্রচণ্ড। কিন্তু তবুও অন্ততঃ মুসলিমদের একাজে এগ্রণী ভূমিকা পালন করা একান্তভাবেই অপরিহার্য। দ্বীনি শিক্ষাদীক্ষা তথা দ্বীনি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের এদেশে এখন ফরয দায়িত্বই হচ্ছে সত্যের সহযোগিতায় এবং মিথ্যার বিরোধিতায় সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা। এছাড়া সসম্মানে বেঁচে থাকার কোনো উপায়ই নেই। দ্বীনি দৃষ্টিতেও নেই দুনিয়াবী দৃষ্টিতেও নেই। অত্যন্ত আশা ভরসার কথা যে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতে সম্প্রতি মুসলিম বিদ্বেষী শক্তিসমূহ পূর্বাপেক্ষা বেশি জোরদার হয়ে উঠলেও এখনো এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান- এ বিশ্বাসী পক্ষপাতহীন মানুষদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত দূরদর্শী মানবগোষ্ঠীকে এ সকল শান্তিপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে সদাসর্বদা ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেই চলতে হবে। আল্লাহ্ তাআলাও পবিত্র কুরআনে মুসলিমদের জন্য এ নির্দেশই জারী করেছেন। বলেছেন যে, যে সকল অমুসলিমরা তোমাদের বাসস্থান, তোমাদের ধর্মকর্ম ও মান-ইজ্জতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা অথবা ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য সমর্থন করেনা, তাদের সঙ্গে তোমরা শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ বজায় রেখে চলো। আল্লাহ্‌র এ আদেশ অতীতকালের জন্য যেমন ছিলো, বর্তমানের জন্যও রয়েছে — ভবিষ্যতের জন্যও অ-বদল থাকবে। কিন্তু যারা প্রকৃতই ইসলাম-দুশমন ও মুসলিম শত্রু তাদের সঙ্গে ক্ষণিক সুখ ও লাভের জন্য বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করা হয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সূরা মুমতাহিনায় উপরোক্ত পরামর্শ দুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٥

অর্থ ঃ ধর্মকে কেন্দ্র করে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন এবং ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ নিশ্চয় ন্যায় পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ কেবল তাদেরই সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বিতাড়িত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম অত্যাচারী (৬০ঃ৮-৯)।

উল্লেখ্য যে, এ সকল দুর্লভ সুশিক্ষাই তো ছেলে মেয়েদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে ইসলামী মাদ্রাসাগুলোতে। বিশ্ববরণ্যে মানবতাবাদী মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মুখেও তো উপরোক্ত আসমানী ফরমানেরই সারাংশ ঝংকৃত হয়েছে এ ভাষায়,

''অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন — তৃণ সম দহে।''

বিস্ময়বোধক ব্যাপার যে, যে সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিরাচরিত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এবং অমূল্য মানবিক সুশিক্ষা বিলকুল বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে, সে সকলের বিরুদ্ধেও মিথ্যা রিউমার রটিয়ে রটিয়ে দেশ দুনিয়ার শান্তশিষ্ট পরিবেশকে সন্দিহান করে তোলার অব্যাহত অপচেষ্টা জারী রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের ভারতে তথা চীনে এবং বর্মাতেই এই দুশ্চক্র এখন সর্বাধিক সক্রিয় রয়েছে। সত্যপন্থীদের জীবনে যে এ হেন অপ্রত্যাশিত, অসহ্যকর বাধা-বিপত্তি আসবেই এ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ বিশ্বপ্রভু সত্যান্বেষীদের এভাবে মোকাবিলা করার পরামর্শ দিয়েছেন —

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থঃ মুসলিমগণ, তোমাদেরকে জান-মাল সবদিক দিয়েই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এই সব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণপূর্বক আল্লাহ্‌র ভয় রক্ষা করে চলতে পারো, তবে নিশ্চয়ই তা হবে অত্যন্ত উঁচুদরের সাহসিক ব্যাপার (৩ঃ১৮৬)।

আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে, এ দেশে আমাদেরকে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, পার্সোনাল ল' প্রভৃতির সুরক্ষার ক্ষেত্রে চক্রান্তকারীদের কষ্টদায়ক কথা ও কাজের মোকাবিলা আল্লাহ্ প্রবর্তিত সুশিক্ষার আলোকেই করতে হবে। আমাদেরকে কথায় কথায় উত্তেজিত করে দিয়ে প্রথমে আমাদেরই দ্বারাতে অঘটন ঘটিয়ে দেওয়ার লাখো চেষ্টা হবে, যাতে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে মন্দত্বে মিলে থাকা মানবগোষ্ঠী তাদের স্বরচিত সন্ত্রাসবাদের নাম দিয়ে আমাদের জান প্রাণ ধন-মানকে যথেচ্ছভাবে বরবাদ করে ফেলার বাহানা খুঁজে পায়। মসজিদ-মাদ্রাসার কমিটি, শিক্ষকগণ এবং মাদ্রাসার ছাত্রগণকেও বাহানাবাজদের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ-সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। নতুবা বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার পরে কুঁয়ো খুঁড়তে বসলে কিছু লাভ হবে কী?

পূর্বপ্রস্তুতি এবং বিচক্ষণতা ছাড়া প্রকাশ্য শত্রুর মোকাবিলা যথা বিহিতভাবে করা আদৌ সম্ভবপর নয়। এই বিশেষ চেতনাটি আমাদের অত্যল্প বলেই একই গর্ত হতে গোখুরা আমাদেরকে বারংবার দংশন করছে। ইসলামের স্পষ্ট উক্তি যে, এটা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় নয়। আমাদের দ্বীনি এদারার আদর্শবান বৌদ্ধিক ফ্যাকট্রি হতে প্রকৃত জ্ঞানবিদ্যা সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসুক সামাজিক সম্মান ও শান্তি শৃঙ্খলার বার্তা বুকে নিয়ে, এই হোক আমাদেরই দান-খয়রাত ও সাদকা যাকাত দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে বড় সাধ স্বপ্নের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তু।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোর চিরাচরিত শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবস্থাপনায়, পরিচালনায় এবং সর্বোপরি শিক্ষা-সিলেবাসে কতকটা অত্যাবশ্যক পরিবর্তন অপরিহার্য। নতুবা নিস্তেজ পরিবেশে সময়ের আহ্বান ও প্রয়োজনকে কার্যকর করে তোলা সম্ভবপর নয় কিছুতেই। বক্তব্যটিকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করলে সহজবোধ্য হয়ে উঠবে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় —

(ক) দ্বীনি মাদ্রাসার সুষ্ঠু সুন্দর পরিচালনার জন্য কার্যকারী সমিতিতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয়ই শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত মানুষবর্গের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। ওলামায়ে দ্বীন কুরআন হাদীসের দার্স ছাড়াও অন্যান্য আরও বাঞ্ছিত বই-পুস্তকের নির্ধারণ করতে বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন। স্বলাত-সওমে পাবন্দ দুনিয়ার আলীমরা দুনিয়াবী ইলমের পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে বেশি দক্ষতা রাখেন। দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষাতেও যেহেতু উভয় শ্রেণিরই সুশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সময়েরই আহ্বান ও প্রয়োজন এবং এজন্যই কমিটিতে দু রকমেরই শিক্ষিত মানুষের সমাবেশ বাঞ্ছনীয়।

(খ) সুষ্ঠু সুন্দর ভাষাজ্ঞান হচ্ছে বক্তার, লেখকের, ওস্তাদের ও মুবাল্লিগের সাফল্য ও জনপ্রিয়তার প্রাণশক্তি। মাদ্রাসার ছাত্রগণকে বিদ্যা অনুশীলনের শেষে উপরোক্ত কাজগুলোর প্রতিই মনোনিবেশ করতে হয়। এজন্যই মাদ্রাসায় আরবী ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-হিন্দী-উর্দু-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষারও যথোপযুক্ত শিক্ষা দান, সময়ের এক জরুরী প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস তথা জেনারেল নলেজ ও কমনসেন্স সংক্রান্ত শিক্ষারও একালে বেশি প্রয়োজন। এজন্যই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটিকে সর্বাবস্থাতেই স্বজন পোষণের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে যথাযোগ্য শিক্ষকদের নিযুক্তির পথ প্রশস্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

(গ) এ দেশে মুসলিমদের দীর্ঘ শাসনের রূপরেখা তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম অবদান সম্পর্কে মাদ্রাসায় পঠন-পাঠন এখন অতিশয় জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশের সংবিধান সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক। নতুবা মুদার্‌রিস ও মুবাল্লিগ মন হতে হীনমান্যতা দূর হওয়া সম্ভবপর নয়। অজ্ঞতা তথ্য হীনতা দীনতাবশতঃ আমরা বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে বোবা-কালা বনে যেতে তথা বহুক্ষেত্রে পরাজিত এবং প্রতারিত হতেও বাধ্য হয়ে পড়ছি। অতএব নিজেকে জানা ও অন্যকে জানানোও জরুরী হয়ে পড়েছে।

(ঘ) মুসলিমরা শুধু খাওয়ারই জন্য বাঁচে না, সুনিশ্চিত যে, তারা বাঁচারই জন্য খায়, অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কেবল মনোরঞ্জন, ভোগবিলাস ও অর্থ সঞ্চয় নয়। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরা এবং খিদমতে খালকের জন্যও তো অর্থেরই অন্য কথায় আয় উপার্জনেরই বড় বেশি প্রয়োজন। আর এজন্যই একালে আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতেও উপার্জনশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা-বুদ্ধির শিক্ষা প্রশিক্ষণ চালু হওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ কথাটিকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে, শিক্ষার্থীদেরকে পুনঃ সাদকা ওশর ইত্যাদির প্রতি ঠেলে দিয়ে পরমুখাপেক্ষী ও আত্মসম্মানহীন বানিয়ে দেওয়া, যার মধ্যে আনুসঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক বহুবিধ দোষ ত্রুটি নিহিত রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে জরুরী পদক্ষেপ এক কথায় ফরযতুল্য।

(ঙ) শিক্ষাদীক্ষার মানকে আরও উচ্চতর, ফলপ্রসূ এবং পক্ষপাতহীন করার জন্য তথা এক অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে আরও গভীরতর ঐক্যানুভূতি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি এবং উত্তর পত্র যাচাই করার ক্ষেত্রে আপোষে লেনদেনের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। বিশ্বাসযোগ্যতা, বন্ধুত্ব এবং সহযোগী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এহেন 'দিবো আর নিবো' মনোভাব প্রদর্শন করা ইসলামী জীবনাদর্শেরই পরিচায়ক।

(চ) ছাত্রদের শরীর স্বাস্থে উন্নতি, বৌদ্ধিক বিকাশ তথা মানসিক প্রফুল্লতার প্রতিও আমাদের দৃষ্টিকে সদা জাগ্রত ও সক্রিয় রাখা অত্যাবশ্যক। জায়েজ খেলাধূলা, স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য, কালচারাল প্রোগ্রাম এবং শিক্ষক ব্যবস্থাপকদের সস্নেহ কথাবার্তা দূরদূরান্ত হতে মাদ্রাসায় শিক্ষার্জনের জন্য আসা দীন দরিদ্র পরিবারের মাসুম ছেলেমেয়েদের দেহে ও মনে প্রভাব বিস্তার করবে আশানুরূপ। মেধাবী ছাত্র হওয়ার জন্য দেহের মনের সুস্থতাও অত্যন্ত জরুরী।

(ছ) মাদ্রাসা প্রাঙ্গণকে এবং ঘর বারান্দাকে যথোচিতভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষরই এক অপরিহার্য দায়িত্ব। যত্রতত্র যাতে আগাছার ঝাড়-জঙ্গল না জমে, তার পরিবর্তে ক্যাম্পাসে সুন্দর ফল-ফুল শোভা পায়, সেজন্য সপ্তাহে কোনো একদিন ছাত্রদের দিয়ে বাগবানীর কাজ নিয়মিতভাবে করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের এক অঙ্গ তথা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সুন্দর এবং সৌন্দর্যকেও খুব পছন্দ করেন, অতএব এ সবের প্রশিক্ষণ দেওয়াও বিপুল সওয়াবেরই অঙ্গ।

(জ) মাদ্রাসার আর্থিক অভাবের জন্য মোটামুটিভাবে অবস্থা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণকে রাজি-খুশি করে খরচ বাবদ কিছু না কিছু সাহায্য গ্রহণ করার নিয়ম চালু হওয়া অত্যাবশ্যক। এলাকার অবস্থা সম্পন্নদের, সঞ্চালন সমিতির মেম্বারদের মুক্ত হস্তে সাহায্য করা অত্যন্ত জরুরী। মাদ্রাসার মেস ম্যানেজারের, অর্থ সচিবের ঈমানদারী আচরণ আরও জরুরী। যোগ্য সচেতন জনগণকে সরাসরি মাদ্রাসার অ্যাকাউন্ট নম্বরে সাহায্য অনুদান জমা করে দেওয়াই শ্রেয়, কেননা চাঁদার অর্ধেক রাশি মোহাস্‌সিলদেরই পকেটে চলে যায়। দ্বীনি মাদ্রাসার আয়-ব্যয়ের সততায় এবং সুস্থ পরিবেশ রচনায় মান্যবর সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষক এবং হেড মুদার্‌রিসের উৎসর্গিত মনোভাবই সর্বাগ্রে কাম্য। একালে অধিকাংশ দ্বীনি মাদ্রাসা বহুল প্রচলিত 'আমানতে খিয়ানত' এবং আত্মসাৎ রোগে আক্রান্ত।

শেষ কথা যে, যেমন করেই হোক আমাদের ঈমান আমলের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র দ্বীনি মাদ্রাসার অস্তিত্ব, ইজ্জতকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা কুরআনের ভাষায় —

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ٥ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا
النُّوْرُ ٥ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ٥ وَمَا يَسْتَوِى
الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَآ
اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ٥

অর্থঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। না অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে। সুশীতল ছায়া ও রোদ সমান নয়। আর না জীবিত ও মৃত সমান (৩৫ঃ ১৯-২২)।

এই সূরাতেই আল্লাহ্ আরও পরিস্কারভাবে বলেন, ‘‘আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল ইল্ম সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাঁকে ভয় করে।’’

আল্লাহ্‌কে ভয়-ভক্তি করার ব্যাপারে দ্বীনি জ্ঞানবিদ্যা অর্জনের গুরুত্ব যখন অত্যাধিক তখন যেমনভাবেই হোক দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা মুসলিমদের জন্য ফরয তুল্য। যারা নিজেদের সন্তানকে দ্বীনি বিদ্যা দিতে অপরাগ ও অসমর্থ, তারা অন্ততঃ গুনাহে কাবীরা হতে আত্মরক্ষার জন্য একাজে দীন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সাহায্য দানের মাধ্যমে সাদকায়ে জারিয়ার হকদার হতে পারেন খুব সহজেই। ভারতবর্ষের মত প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীনি জ্ঞানবিদ্যাকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্বে অংশ গ্রহণ করা আরও বেশি সওয়াব ও সম্মানের কাজ। কুরআনকে যে ব্যক্তি নিজে শিখে এবং অন্যকেও শেখায় ও শিখতে সাহায্য করে তাদের মর্তবা আল্লাহ্ তাআলার নিকট অত্যধিক। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দ্বীনের এই ফরয কাজে আরও বেশি উৎসাহ, আনন্দ দান করুন — আমীন।

২য় পর্ব

বিশ্ব শান্তির জন্যই ইসলামের নব জাগরণ জরুরি

মোঃ জিনাতুল্লা সেখ

মুসলিম দেশের সেই স্পেনে মুসলিমদের আমলে সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। আর তার জন্য দেশটিতে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়। ভাগ্যের পরিহাস কিন্তু স্পেনের মুসলিমরা এ অগ্রগতি ধরে রাখতে পারেনি। সামরিক দুর্বলতার জন্য স্পেনের মুসলিমরা হয়ত ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, নয়ত খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। একইভাবে ফিলিস্তিনি মুসলিমরাও তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখানে মূলতঃ মুসলিমরা নয়, খ্রিষ্টানরাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে। মুসলিমরা ৮ শত বছর ভারত শাসন করেছে। কিন্তু তারা ছিল ভারতে সংখ্যালঘু। এহেন প্রেক্ষাপটেও এই ভারতবর্ষে মোগল সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন অমুসলিম। সুফী সাধকরা বঙ্গদেশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার করেছেন। আর আজ সেই ভারতের আমরা মুসলিম কত লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত, আর অনেকের ধারণা যে, ইসলাম প্রচার করা হয়েছে তরবারির জোরে, না একথা ভ্রান্ত কোথাও তরবাবির জোরে ইসলাম প্রচার করা হয়নি। বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ দা স্পিরিট অব ইসলাম-এ অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মুসলিম শাসনে সংখ্যালঘুরা শান্তিতে বসবাস করলেও অমুসলিম শাসনে মুসলিমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছেনা। আমি এখানে যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তুলে ধরছি, এর লক্ষ্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে মুসলিমদের উসকানি দেওয়া নয়। আমি বরং এ কথায় বলতে চাই যে, একজন সত্যিকার মুসলিমকে অবশ্যই অমুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। যেহেতু আমরায় বলেছি যে, বিশ্ব শান্তির জন্যই ইসলামের নবজাগরণ জরুরী। অনুরূপ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের আত্মাকে সোঁপে দিল সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ পেয়ে গেল’’ (সূরাহ্ বাক্বারাহ্/২০৭)। আর মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী এই জন্যই অমুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার এবং তাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার জন্য মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ

বিশ্ব শান্তি সৃষ্টির মূলে আমার মতে অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের কল্যাণ সাধণের এটাই সর্বোত্তম উপায়।

দারিদ্রের বিশ্বায়ণ

আমরা দেখেছি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে এখন পশ্চাতের সঙ্গে প্রাচ্যের বিশেষ করে ইসলামের সংঘাতে বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া অধ্যায় এবং নব্য উপনিবেশবাদের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইউরোপে আদর্শিক বিভাজন বিদূরিত হওয়ায় সেখানে রোমান ক্যাথলিক অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজন পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা অভিন্ন ইতিহাসের অংশীদার। আর সামন্তবাদ রেনেসাঁ, রিফরমেশন মুভমেন্ট, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। আর পক্ষান্তরে, অটোমান ও জার সাম্রাজ্য বসবাসকারী অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে এ কারণে এরা পাশ্চাত্যের করুণার পাত্রে পরিণত হয়।

বিশ্ব শান্তির জন্য অর্থনৈতিকের প্রয়োজন একটা বড় সমস্যা হয়ে বিশ্ব শান্তিতে বাধা হয়ে পড়ে এবং সেই জন্য আমরা অন্যের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকি। আমরা জানি যে, বিশ্বে অন্যরা অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ায় পাশ্চাত্য প্রাচ্যের অনুন্নত মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে তাদের পণ্য বিক্রির জন্য বাজার খুঁজতে শুরু করে। বস্তুত বিশ্বায়ণ মুসলিম দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করার একটি নয়া ব্যবস্থায় পর্যবসিত হচ্ছে। কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখনও অবাধ বাজার অর্থনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এজন্য আমাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত হওয়ার কারণ। কিন্তু অন্যরা এ সম্পর্কে অনেক জ্ঞানী তাই তাদের জ্ঞানের দক্ষতায় প্রতিযোগীতামূলক বাজার অর্থনীতির সাফাই গাওয়া সত্বেও বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে ৫ থেকে ৬টি বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। যেমন একটি কোম্পানী বিশ্ব রফতানী বাণিজ্যের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

যার কারণে পশ্চিমা মূল্যবোধকে সার্বজনীন হিসাবে প্রচার না চালানোর জন্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্তের জন্য আমাদের জ্ঞানের অভাব সেইহেতু আমরা এসবে পিছিয়ে পড়ে গিয়ে বিশ্ব শান্তির অবক্ষয় ঘটাচ্ছি। কিন্তু এতে বিত্তশালী দেশগুলোর ক্ষমতার ঔদ্ধতাই প্রতিফলিত হচ্ছে।

ব্যক্তি স্বতন্ত্র উদার নৈতিকতাবাদ, মানবতাবাদ, সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইন, গণতন্ত্র, অবাধ বাজার এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা শুধু ইসলাম নয় যেমন কনফুসীয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেরও পুরোপুরি পরিপন্থী। কেমন ব্যাপার স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের, গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের, পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, কর্তৃত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার, দায়িত্বের সঙ্গে অধিকারের এবং সাম্যের সঙ্গে বৈচিত্রের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী সভ্যতার একটি ভিন্নতর ধারণা রয়েছে।

প্রচার মাধ্যম ও ভ্রমণের কল্যাণে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে এবং এভাবে বিভিন্ন সভ্যতায় সচেতনতা জোরদার হচ্ছে। এই সচেতনতা এমনই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে, যেমন প্রসার মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচণ্ডভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। আর এই তো কদিনের ঘটনা ঘটে গেল অমৃতসরে দশেরার উৎসব চলাকালীন ট্রেনে চাপা পড়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু। এতে দেশের অর্থাৎ সারা ভারতের মানুষ বা জাতিবাদে শুধুমাত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবল চেষ্টা করেছিল। এতে ওদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক রং দিতে সোশ্যাল মিডিয়া উঠেপড়ে লাগে একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী। তারা দাবি করতে থাকে যে চালক মুসলিম ছিল বলেই এতজনের উপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চালকের নাম দিয়েছিল ইমতিয়াজ আলি এই নামেই জনরোষ তৈরি হয়।

কিন্তু যখন তদন্তে ঘটনার তথ্য বেরিয়ে এল তখন দেখা গেল ট্রেনের চালক ইমতিয়াজ আলি নয় হিন্দুত্ববাদীদেরই একজন নাম ছিল তার অরবিন্দু কুমার। এভাবেই দুধ-পানি আলাদা হয়ে যাওয়ায় মুখ পুড়েছে হিন্দুত্ববাদীদের। মুসলিমদের নিশানা করে যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র তারা করেছিল, তা অবশেষে ফাঁস হল। তাহলে বিশ্বশান্তি কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা জানি এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকজন তাদের নিজস্ব পরিচিতি ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ফলে জাতি রাষ্ট্রের ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ ধর্ম, জাতি রাষ্ট্রের শূন্যতা স্থান পূরণ কৈরছে।

৭ম পর্ব

দূর আরবের স্বপ্ন

মোহাম্মদ জাকারিয়া

ওহুদের প্রান্তরে যুদ্ধের সময় নাবীজির দাঁত ভেঙ্গে ছিল, মাথা ফেটে ছিল, সর্বোপরি সারা দেহে একশোরও বেশি আঘাত লেগেছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামজা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) র শাহাদাত বরণ এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা কর্তৃক তার বক্ষ ফেড়ে কলিজা চিবানোর দৃশ্য সহ ৭০ জন সাহাবীর শাহাদাত বরণে মানসিক আঘাতও কম ছিল না। সেই ওহুদের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের তায়েফের ঘটনার বিষয়বস্তু, নাবীজীর অন্তরে দাগ কেটে থাকা কতই না তাৎপর্যপূর্ণ।

নাবীজী, উত্‌বা ও শায়বার আঙ্গুর বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেহ এবং পা হতে রক্ত ঝরছে। ঐ সময় দুবৃর্ত্তরা কেউ ছিল না। নাবীজির চেতনা ও কিঞ্চিৎ ফিরে আসছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ করে অবস্থা অনুভব করার মত জ্ঞান-বোধ তার ফিরেছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্য শান্তির উৎস রাহমানুর রাহিম, রাব্বুল আলামিন, সৃষ্টিকর্তা, পরওয়ার দিগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করলেন। নাবীজির অভ্যাস ছিল কোনো বিষয়ে যখন তিনি বিব্রত হতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করতেন, তখন তিনি স্বলাতের আশ্রয় নিতেন (মিশকাত)।

নাবীজি এই চরম দুঃখ-বেদনা, দুরাবস্থা ও দুর্দশার সময়ে শরণাপন্ন হলেন আল্লাহ্ তাআলার। দু রাকাআত স্বলাত পড়লেন। স্বলাতান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুললেন যার পথে তিনি এই দুরাবস্থা ও দুর্দশার শিকার হয়েছেন (যুরকানী ১/৩০৫)।

নাবীজি সেই আপনজনকে সম্বোধন করে দুআ মোনাজাত করলেন। দুরাবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে, নাবীজির এই প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌তে আত্ম নির্ভরশীলতার পূর্ণতম ও পূণ্যতম আদর্শ। নাবীজির বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভীষণ উৎস ছিল, আল্লাহ্‌তে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অটুট বন্ধন ছিল, আল্লাহ্‌তে অনুরক্ত যে ভীষণ ভাবাবেগ ছিল, এই দুআটি ছিল তার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দুআটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় অতি শত্রু ও বলতে বাধ্য হবে যে বিশ্বের প্রতি নাবীজির এই আহ্বান যে স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক তার প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর তীব্র আলোকপাত এই দুআ।

নাবীজীর জীবনী রচনাকার, নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারী ও এই দুআটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হয়ে বলেছে — It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling (Life of Mohamed by William Muir).

দুআটি হল — ''আল্লাহুম্মা ইলাইকা আশকু জুফা কুওয়াতি ওয়া কিল্লাতা হিলাতি ওয়া হাওয়ানি আলান নাসি আল্লাহুম্মা ইয়া আরহামার রাহিমীন আনতা রাব্বুল মুসতাজ আফিনা ওয়া আনতা রাব্বি ইলা মানতা কিলুনি ইলা বায়িদে ইয়া তাহাজ্জামুনি আও ইলা আদুবেবম মাল্লাকাতাহু আমরি ইনলাম ইযাকু বিকা গাজাবুন আলাই ইয়া ফালা উবালী ওয়ালাকিন আফিয়াতুকা হিয়া আও সাউনি আউযুবি নুরে ওয়াজ হিক্‌কাল্লাজি আশরাফাত লাহুত্ জালুমাতু ওয়া সালুহা আলাইহি আমরূদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে মিঁই ইয়াফ্‌জিলা বি গাযাবুকা আও ইয়া হিল্লা আলাই ইয়া সাখাতু ওয়া লাকাল উত্‌বা হাত্তা তারজা ওয়ালা হাওলা ওলা কুওয়াতুন ইল্লা বিকা''। অর্থাৎ আয় আল্লা আয় আল্লা! তোমার নিকট ব্যক্ত করছি আমার দুর্বলতা এবং এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আল্লাহ্! হে পরম দয়াময়। তুমি সকল দুর্বলদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। তুমি আমাদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। তুমি আমাকে কার হাতে সমর্পণ করছ? অপরের হাতে যে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে আসে? বা শত্রুর হাতে যার ক্ষমতায় দিলে আমার সবকিছু। প্রভু হে! আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ। আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না থাকলে আমি এই সব বিপদ আপদের কোনো পরওয়া করি না। তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমাদের জন্য প্রশস্ত (আমি ইহা হতে বঞ্চিত হব কেন)। প্রভু হে! তোমার যে পূণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায়, যার কল্যাণে ইহ-পরকালের শান্তি-শৃঙ্খলা, সর্ব বিষয়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পূণ্য জ্যোতির সব নিয়ে প্রার্থনা করছি। তোমার অসন্তোষ যেন আমাকে ছুঁতে ও না পারে, তোমার কোপ বা অনল দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য। আমি যেন সর্বদা তোমার সন্তোষ লাভ করতে পারি। তুমি আমার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাক, এই আমার আরাধনা। আমার বল ভরসা একমাত্র তুমিই। তুমি ভিন্ন আমার কোনো সম্বল নেই। আমার শক্তি সামর্থ্য সবকিছু তোমার উপর

নির্ভর করে (বিদায়াহ্ ৩/১৩৬)। নাবীজি এইভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে আর্জি জানালেন। চরম ও পরম অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে।

বাগানের মালিক উতবা ও শায়বা নাবীজির চরম শত্রু ছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কাফের থেকে বদর রণাঙ্গণে নিহত হয়েছিল। কিন্তু তাদেরই বাগানে নাবীজির রক্ত ঝরা দেহের এমন এক মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল যে ওরা দেখলে পরম শত্রু চরম নিষ্ঠুর না হলে তার প্রাণ কেঁদে উঠবেনা নাবীজির এই করুণ অবস্থা দেখে উতবা ও শায়বার ন্যায় পরম শত্রুর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হল। তাদের বাগানের মালী ছিল একজন খৃষ্টান আদ্দাস রুমী। তারা মালিকে বলল যে, গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্রে করে ঐ লোকটিকে দিয়ে এস। তাকে এগুলো খেতে বলি ও আদ্দাস নাবীর সম্মুখে আঙ্গুরের ছড়া রেখে দিল। নাবীজি বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহীম বলে খাওয়া শুরু করলেন। আদাস উক্ত বাক্য শ্রবণে নাবীর নূরানী চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং বলল যে, এরূপ কথা তো এদেশের লোকের মুখে কখনও শোনা যায় না। আদ্দাসের ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তর এল আমি ঈসায়ী ধর্মের লোক। আমার দেশ (ইরাক মাসুল এলাকায়) নীনওয়া অঞ্চলে। নাবী বললে ওটা এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউনুস (আলাইহিস্ সালাম) এর দেশ। আদ্দাস আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এটা জানলেন কি করে? নাবীজি বললেন, তিনি আমার সম শ্রেণির ভ্রাতা। তিনি আমাদের মতই একজন নাবী ছিলেন। কথাগুলো শুনে আদ্দাস নাবীজির হাত, পা, মাথা চুম্বন করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তায়েফের মাটিতে তাওহীদের বীজ বপ্ত হল।

বর্তমান তায়েফে ঐ বাগানের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘মাসজিদে আদ্দাস’। ২০১৭ সালে উমরাহ্ এর সময় আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তায়েফ উপস্থিত হবার তাওফীক দান করেছিলেন । সস্ত্রীক উক্ত মসজিদে দু’রাকাআত স্বলাত আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং উক্ত বাগানেও পৌঁছাবার তাওফীক আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। এখনও আঞ্জির, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের একটি বাগানও রয়েছে দেখলাম। এইভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট ও যাতনার মধ্যে নাবীজি শুধু তায়েফ নগরীতে ১০ দিন এবং তায়েফের আশেপাশে পথে প্রান্তে আরও কয়েকদিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালালেন। এই সফরে তাঁর ১ মাস কাটল। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তায়েফ সফরে গেছিলেন সে উদ্দেশ্য হাসিল হল না। তায়েফবাসী বানু শকীফ গোত্র ইসলামের আহ্বানে সেদিন সাড়া দেয়নি। প্রত্যাখ্যান করেছিল নাবীজির আহ্বানকে।

তায়েফবাসীরা নাবীর উপর অমানসিক অত্যাচার করেছে। অত্যাচারের মাত্রা এত ছিল যে উহা ওহুদের কষ্টকেও ছাড়িয়ে গেছে। অত্যাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ ও বদ্ দুআ করার এটাই ছিল বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময়। ইহুদী বুড়ি যেখানে নাবীজির রাস্তায় কাঁটা দিত সেই ইহদী বুড়ির বাড়ির কাছেই নাবীজির সঙ্গে জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর কথা হত। ফাঁকা জায়গার এক পাশে একটা মেম্বার আর এক পাশে একটা মাসজিদ। সে মেম্বার ও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আর আল্লাহ্ ঐ মাসজিদে ২ রাকাআত স্বলাত পড়ার তাওফীকও দিয়েছেন। মসজিদে মুহাম্মাদীতে।

মেম্বারে নাবীজি বসে আছেন। জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে কথা হচ্ছে। নাবীজির অনুমতি অপেক্ষা। তায়েফবাসীদের সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু না! নাবীজি তাদের প্রতি বদ্ দুআ করেননি। কি বলিষ্ঠ ছিল তার বিশ্বপ্রেম। কি প্রাণ ঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি। দয়ার সাগর, ধৈর্যের পাহাড় রাহমাতুল-লিল- আলমিন সে অনুমতি মোটেই দেন নি। বরং তারা তাকে চেনে না বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা যোগ্য মনে করে দরবারে এলাহিতে সুপারিশ করেছেন এবং তাদেরকে হেদায়াত দান করার জন্য দুআ করেছেন। তার আশা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন যে, যদিও বর্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনল না, আমাকে আঘাত দিয়ে তাড়িয়ে দিল কিন্তু তারা বেঁচে থাকলে তাদের ঔরসের সন্তান সন্ততি হয়ত ঈমান আনবে। এই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র দরবারে উল্লেখ করে নাবী তাদের আল্লাহ্‌র গযব হতে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কি অদ্ভুত দূরদৃষ্টি!

নাবীজি তায়েফ এলাকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীন বোঝাবার চেষ্টায় কত অত্যাচার ও নির্যাতনই না ভোগ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তায়েফে তার উদ্দেশ্য সফল হল না। তিনি নিরাশ হলেন। সফর শেষে ব্যর্থতার ব্যথা ও বিষন্নতা নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য তায়েফ হতে যাত্রা করলেন।

নবুওয়তের দশম বৎসরে শওয়াল মাসের শেষ দিকে নাবীজি তায়েফ পানে যাত্রা করেছিলেন। এই সফর ছিল এক মাসের। তিনি যিলকদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

গীবত এবং তা থেকে মুক্তির উপায়

আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম আলিয়াভী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُهٗ .

আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত হল জিহ্বা। মানুষের জিহ্বা এমন একটি মাংসপিণ্ড যার দ্বারা মানুষ ধ্বংসের অতল তলে ডুবে যেতে পারে এবং সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন হতে পারে। ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, গীবত, মিথ্যা, মুনাফেকী ইত্যাদি এ সকল পাপকার্য জিহ্বা দ্বারা হয়ে থাকে। মানুষের জিহ্বা দ্বারা যে সমস্ত পাপ হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি পাপ হল গীবত (পরনিন্দা) করা।

গীবত নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ ঃ হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ তোমরা অধিক ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করোনা আর তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু (সূরা আল্ হুজরাত, আয়াত নং ১২)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম জাতিকে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন —

১। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা যাবেনা।

২। কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা যাবেনা।

৩। কারো ব্যাপারে গীবত (পরনিন্দা) করা যাবেনা।

উপরোক্ত তিনটি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মানুষ বিরত থাকতে অক্ষম। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষ এ তিনটি বিষয়ের সাথে যুক্ত যা অত্যন্ত বড় পাপের কাজ। এগুলো অনেক সময় ভাবনাতেই আসেনা যে এ অপরাধের জন্য কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ কাউকে নিষ্কৃতি দেবেন না। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে অত্র আয়াতটিকে বুঝার সুমতি দিন আমীন।

গীবতের আভিধানিক পরিচয় ঃ গীবত (الغيبة) শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা হলেও শব্দটি প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির নিকট অতীব পরিচিত একটি শব্দ। আরবী গীবত শব্দের অর্থ হল পরচর্চা বা পরনিন্দা করা।

গীবতের পারিভাষিক পরিচয় ঃ পরিভাষায় গীবত বলা হয় কোনো মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান কোনো দোষ তার অসাক্ষাতে আলোচনা করা যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।

গীবতের পরিচয় দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যা বলেছেন ঃ সহীহ্ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فَقِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তোমার মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞাসা করা হলো যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বিদ্যমান থাকে? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তুমি যে দোষ ত্রুটির কথা বললে তার মধ্যে সে দোষ ত্রুটি থাকলেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি দোষ ত্রুটি

না থাকে তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগালে (সহীহ্ মুসলিম হা/২৫৮৯, সহীহুল জামি হা/৮৬, সিলসিলাতুস্ সাহীহাহ্ হা/১৪১৯, আবূ দাউদ হা/৪৮৯৪)।

অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, তোমার ভাই সম্পর্কে তার অসাক্ষাতে কিছু বলায় বিষয়টি ব্যাপক। তার শারীরিক কোন বিষয়েও হতে পারে, তার জান, মাল, চরিত্র এমনকী আর্থিক, পারিবারিক, সন্তান সন্ততি কিংবা পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়েও হতে পারে। আর কারো সম্পর্কে গীবত যে শুধু মুখের ভাষায় হবে এমনটি নয় কারো লেখনির মাধ্যমে, কারো ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে। মোট কথা যা দ্বারা অন্যের কাছে তোমার মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি তুলে ধরবে এবং সে তা বুঝতে পারবে ও অপছন্দ করবে সেটাই গীবত যা সম্পূর্ণ রূপে হারাম (মিরকাতুল মাফাতীহ শারহুন নাবাবী হা/২৫৮৯/৭০ আওনুল মাবুদ ৮ম খণ্ড হা/৪৮৬৬)।

কোনো ছোট জিনিসকে গীবত মনে না করা ঃ অনেকের ধারণা মতে ছোট ছোট বিষয়ে যেগুলো গীবত মনে করা হয়না অথবা বলে থাকেন যে এগুলো গীবত নয় এটাতো একটা সাধারণ বিষয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ছোট ব্যাপার হলেও তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর একটি হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে এসেছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَ كَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.

অর্থ ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললাম সাফিয়্যাহ্ এর সম্পর্কে আপনাকে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। অর্থাৎ সে বেঁটে। একথা শুনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তুমি এমন একটা কথা বললে যদি একে সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে তা সমুদ্রকে পরিবর্তন করে দেবে (সহীহ্ আবূ দাউদ হা/৪৮৭৫, তিরমিযী হা/২৬৩২, সহীহুল জামি হা/৯২৭১)।

এই হাদীসে আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, এখানে আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে শুধু ছোট কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সামনে বলেছেন। একথা শুনেই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, যে তোমার এই ছোট কথাটিকে যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তোমার এই ছোট কথাটি সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে।

যারা আজকে গীবত, পরনিন্দা করার পরেও এটা ছোট একটা ব্যাপার বলে উপেক্ষা করে চলছে তাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং গীবত থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

গীবতকারীর পরিণাম ঃ গীবতকারীর পরিণাম লেলিহান অগ্নিকুণ্ড জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

অর্থ ঃ হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি চোগলখোর জান্নাতে যাবেনা (সহীহ্ বুখারী হা/৬০৫৬, সহীহ্ মুসলিম হা/১৬৯, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৫৭৬৫, তিরমিযী হা/২০২৬, আবূ দাউদ ৪৮৭১)।

অত্র হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা চোগলখোর তাদেরকে আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন না অর্থাৎ তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অত্র হাদীসের মধ্যে চোগলখোর কথাটির আরবী প্রতিশব্দ হল قَتَّاتٌ আর قَتَّاتٌ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কারো গোপন কথা আড় থেকে সতর্কতার সাথে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং সেটা অন্যের কাছে কিংবা ঐ লোকের প্রতিপক্ষের নিকট তা পৌঁছে দেয়। আর সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় نَمَّامٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। نَمَّامٌ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে প্রকাশ্যে থেকেই কারো কথা শুনে এবং অপরের কাছে পৌঁছে দেয়। এ উভয় কর্মই হারাম ও নিন্দনীয়, কেননা এতে উদ্দেশ্য থাকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করা অথবা অনিবার্য কারণেই এতে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া কলহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এরূপ কর্ম সম্পূর্ণ হারাম।

গীবতকারী কিয়ামতের দিনে সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ شَر النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

অর্থ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সব থেকে নিকৃষ্ট তাকে পাবে যে দ্বিমুখী (কপট) সে একমুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায় (সহীহ্ বুখারী হা/৬০৫৮, সহীহ্ মুসলিম হা/২৫২৬, সহীহ্ আল্ আদাবুল মুফরাদ হা/৩১৬)।

দুই চেহারা বিশিষ্ট লোক হল মুনাফিক। তারা একদলের কাছে বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি অন্য দলের কাছে গিয়ে বলে আমরা মূলত তোমাদের সাথে আছি।

বিখ্যাত হানাফী মোল্লা আলী কারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ফাসাদ সৃষ্টি করা।

আল্লামা নাবাবী বলেন, এরা প্রত্যেক দলের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে তাদের দলের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের হিতাকাঙ্খী বলে প্রচার করে থাকে। গীবতকারীর এটা একটি ভয়ংকর রূপ।

এক নজরে গীবতের ক্ষতি সমূহ ঃ গীবত থেকে যে সব ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে যেমন —

(ক) ইহলৌকিক ক্ষতি ঃ—

১। গীবত করলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

২। গীবত করলে একে অপরের মাঝে রাগ সৃষ্টি হয় ফলে এতে ঝগড়া বিবাদের সম্ভাবনা থাকে।

৩। গীবত করলে সাময়িকভাবে বিপক্ষকে খাটো করা হয়।

৪। গীবতকারী কথার মাঝে মিথ্যা কথা যুক্ত করে ফলে তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যায়।

(খ) পারলৌকিক ক্ষতি ঃ—

১। গীবতকারী কিয়ামতের দিন সব চাইতে নিকৃষ্ট হবে।

২। গীবতকারী জাহান্নামে যাবে।

গীবত থেকে মুক্তির উপায় ঃ— গীবত থেকে কয়েকটি মুক্তির উপায় নিম্নে আলোচনা করা হল —

১। জিহ্বার হিফাজত ঃ প্রথম হাদীস ঃ মানুষ যদি জিহ্বার ভালো ভাবে হিফাজত করতে পারে তাহলে গীবতের মত একটি জঘন্যতম অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং তার দ্বারা কখনো গীবত সংঘটিত হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا.

অর্থ ঃ সুফইয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ্ আস্ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস কোন্‌টি? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটা (তিরমিযী হা/২৪১০, ইবনে মাজাহ্ হা/৩৯৭২, দারেমী হা/২৭১১, আহমাদ হা/৪১৩)।

অত্র হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহ্বা সব চাইতে মারাত্মক। জিহ্বা দ্বারাই মানুষ বেশি বেশি গোনাহের কাজ করে। সুফিইয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ যখন বললেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি আমার জন্য সব চাইতে ভয়ংকর জিনিস কোন্‌টিকে মনে করেন? তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটা। অর্থাৎ এটা তোমার জন্য আমি বেশি ভয়ের আশঙ্কা করি। কারণ জিহ্বা দ্বারাই সমস্ত পাপ সংঘটিত হয়। জিহ্বা দ্বারা গিবত, কুৎসা রটনা করা, মিথ্যা, অশ্লীল বাক্যালাপ এ সমস্ত পাপ জিহ্বা দ্বারা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ—

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ সাহল ইবনু সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দু চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর জামিন হবে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব (সহীহ্ বুখারী হা/৬৪৭৪, সহীহুল জামি হা/৬৬১৭, তিরমিযী হা/২৪০৮)।

অত্র হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করা জান্নাত লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দু চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং দু পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর রক্ষা করার দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللّٰهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ اَتَدْرُوْنَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْاَجْوَافَانِ اَلْفَمُّ وَ الْفَرْجُ.

অর্থ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি জানো মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? সেটা হল আল্লাহ্ ভীতি ও উত্তম চরিত্র। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? সেটা হল দুটো গহ্বর, একটি মুখ অপরটি লজ্জাস্থান (হাদীসের মান হাসান তিরমিযী হা/২০০৪, আদাবুল মুফরাদ হা/২২২, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা/৪৭৬, আহমাদ হা/৯৬৯৬)।

২। নিরবতা অবলম্বন করা ঃ—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَمَتَ نَجَا.

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিশ্চুপ রইল সে মুক্তি পেল (সহীহ্ আহমাদ ৬৪৮১, তিরমিযী হা/২৫০১, সহীহুল জামি হা/৬৩৬৭)।

৩। অধিক সময় বাড়ির মধ্যে অবস্থান করা ঃ—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَالنَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَالْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

অর্থ ঃ উকবাহ ইবনে আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম) মুক্তির উপায় কী? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখো, তোমার ঘর তোমার জন্য যেন প্রশস্ত হয় এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো (সহীহ্ আহমাদ হা/১৭৩৩৪, তিরমিযী হা/২৪০৬, আল্ মুজামুল কাবীর হা/১৪১৬০)।

এখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রশ্নকারী উকবা ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বাঁচার জন্য তিনটি বিষয়ে আদেশ দান করেছেন। (১) জিহ্বার হিফাজত করা, (২) নিজের বাড়িকে প্রশস্ত করা, (৩) নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের বাড়ি প্রশস্ত হওয়ার কথা বলেছেন এর অর্থ হল যে, তুমি তোমার বাড়িতে অবস্থা করবে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি ত্যাগ করবে না এবং এটাকেই তুমি গনিমাত মনে করবে। কারণ বাড়ির বাইরে অবস্থান করলে মিথ্যা, গিবত, কুৎসা বর্ণনা করার সম্ভাবনা আছে এই জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বাড়িতে অবস্থান করতে বলেছেন।

এক নজরে গীবত থেকে বাঁচার উপায় ঃ— (১) জিহ্বার হিফাজত করা। (২) নিরবতা অবলম্বন করা। (৩) বাইরের প্রয়োজন পূরণ হলেই বাড়ির মধ্যে অবস্থান করা।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের যদি আমরা মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে আমরা গীবতের মত জঘন্যতম অপরাধ থেকে ফিরে আসতে পরবো - ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে গীবত ও পরনিন্দা করা থেকে বিরত রাখেন। আমরা যেন এ থেকে বিরত থাকতে পারি — আমীন।

১ম পর্ব

ক্রোধের ভয়াবহতা ও তার শারঈ চিকিৎসা

হাসিবুর রহমান বুখারী

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

الَّذِيْنَ يُنفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ ঃ যারা স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয়ের মধ্যেই ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন (সূরাহ্ আলে ইমরান ৩/ ১৩৪)।

ক্রোধ বা রাগ কোনো সমাধান নয়, বরং এটা আমাদের ঈমান ও শরীরের জন্য ধ্বংসাত্মক শত্রু। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে মহা বিপত্তিকর বিষবৃক্ষ।

''কারো থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের সময় যে তোলপাড় সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোধ বলে।'' ক্রোধ যেমন মানুষের ঈমান ও আত্মার শত্রু, তেমন অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ স্বাস্থ্যেরও বড় শত্রু। ক্রোধের কারণে মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়। চেহারা বিবর্ণ হয়, শিরা-উপশিরা ফুলে যায়, মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যার ফলে আমাদের দ্বারা অনায়াসে অশ্লীল কথা ও অশালীন আচরণ প্রকাশ পায়।

'ডেডলি ইমোশন্স' গ্রন্থের লেখক ড. ডন কোলবার্ট-এর মতে ''রাগ আপনার স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।'' ড. কোলবার্ট সতর্ক করে বলেন, ''বিষন্নতা, রাগ, অপরাধবোধ, দোষারোপ, আত্মবিশ্বাসের অভাব এগুলো প্রাণঘাতী টক্সিনের নামান্তর।''

ক্রোধের ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সমূহ ঃ—

(১) পারস্পরিক সম্পর্কে ভাঙন ঃ অন্য যেকোনো আবেগ অপেক্ষা ক্রোধ সম্পর্কের জটিলতাগুলো আরো ভয়ঙ্কর করে তোলে। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা অন্য কোনো ব্যক্তি, সকলেই কিন্তু রাগী মানুষকে অপছন্দ করে, তাই এড়িয়ে চলতে চায়। সর্বাধিক ভালোবাসা ও পছন্দের সম্পর্ক হল 'স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক'। কিন্তু ক্রোধান্বিত হয়ে এরাও একে অপরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনা। যার মাশুল দিতে গিয়ে পুরো জীবনটা হয়তো বা অন্ধকার কারাগারে নয়তো বা কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে ধ্বংস হয়ে যায়। এরকম উদাহরণ আমরা প্রায়ই পত্রপত্রিকায় দেখতে পায়।

২। পারিবারিক ক্ষতি ঃ সুখী পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস অত্যাবশ্যকীয় (ক) Understanding (পরস্পর বোঝাপড়া) একে অপরকে উপলব্ধি করা, তার অবস্থান, অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলো বুঝার চেষ্টা করা এবং বিপরীতধর্মী কোনো কিছু না করা।

(খ) Compromise (সমঝোতা করা বা আপোষ করা)। সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে টুকটাক ঝামেলা হয়েই থাকে। তাই বলে একে অপরের উপর রাগ ও অভিমান নিয়ে বসে থাকলে সমাধান কোনো দিনই সম্ভবপর হবেনা। স্ত্রী ভাবছে ''আমি ওর জন্য বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু ত্যাগ করেছি, কত ভালোবাসি ওকে, কত যত্ন নিই ওর, আর আজ সামান্য কারণে রেগে কথা বলছেনা, না বললে কী হবে? আমি বলবোনা।'' স্বামী ভাবছে ''আমি ওর জন্য কত পরিশ্রম করি, ওর সব চাওয়া- পাওয়া ও আবদার পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করি, পরিবর্তে এতটুকুই তো চেয়েছিলাম যে, আমার অপছন্দ কোনো কাজ করবেনা। এই ছোট্ট দাবিটুকু রাখতে পারলোনা?'' দুজনেই যদি রাগ অভিমান ত্যাগ না করে একে অপরের দিকে আপোষের জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে সংসার সুখী হবে কী করে?

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শিক্ষণীয় আদর্শ —

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهٖ فَأَرْسَلَتْ اِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتُ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِىْ كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَ

يَقُوْلُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِّنْ عِنْدِ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلٰى الَّتِىْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَاَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِىْ بَيْتِ الَّتِىْ كَسَرَتْ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, কোনো এক সময় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর (আয়েশা রাযিয়লাল্লাহু আনহার ঘরে) কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনের আর একজন (সম্ভবত তিনি উম্মে সালামাহ) একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি ভেঙ্গে গেল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলি কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে লেগেছে। তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর নিকট হতে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তার কাছে পাঠালেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার ঘরেই রাখলেন (বুখারী হা/৫২২৫)।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে সকলের সামনে এই রকম একটা ঘটনা ঘটালেন তা সত্বেও ধৈর্যের প্রতীক বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা না করে তাঁকে সাপোর্ট করলেন যে, ''তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে'' এবং তিনি সাহাবাদের মনে করিয়ে দিতে চাইলেন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা, তাই তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে নাম ধরে না ডেকে 'তোমাদের মা' বলে সম্বোধন করেছেন।

পজিটিভ উপদেশ ঃ কেউ রেগে গেলে তার প্রতি পাল্টা রাগ না করে তাকে বুঝার চেষ্টা করুন। সমস্যার সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ্।

(৩) সামাজিক ক্ষতি ঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক কঠিনতম কাজ হল 'দশজন মানুষের মত ও চিন্তাভাবনা এক হয়ে যাওয়া।' সমাজে কল্যাণমূলক কাজ দশ-বিশ জনকে নিয়েই করতে হয়, যাদের চিন্তাভাবনার মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন তাই মতপার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন আপনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি, সততার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, তা সত্বেও আপনার সততা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠবেনা তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? এবার আপনি যদি ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, ''এতো স্বচ্ছ ও স্বার্থহীনভাবে দায়িত্ব পালন করেও আজ আমার সততা কালিমালিপ্ত ! !যা .... শা ...... দায়িত্বই ছেড়ে দেবো।'' তাহলে কি আপনার দ্বারা কোনো কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদিত হবে? আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ - যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৫৪)।

অন্যদিকে যারা অসৎ, স্বার্থোদ্ধত দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের শত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলেও দায়িত্ব ছাড়েনা, বরং পরবর্তীতে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আন্দোলন করে, এদের মত লোক ক্ষমতায় আসলে কি সমাজে উন্নয়ন হবে? দ্বিতীয় ব্যক্তির দুনিয়াবী স্বার্থ এত শক্তিশালী যে শত ভর্ৎসনাও তাকে দুর্বল করতে পারেনা, আর আপনার পরকালের স্বার্থ এতই দুর্বল যে আপনি সামান্যতেই ভেঙে পড়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ

الْقِيٰـمَةِ فَـمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

প্রতিটি আত্মা মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে এবং কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় বিনিময় দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হল এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হল, অবশ্যই সে ব্যক্তি উত্তীর্ণ হল, কেননা পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় (সূরা আলে ইমরান ৩/১৮৫)।

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শিক্ষণীয় আদর্শ —

عَـنْ اَنَـسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ عَـلَيْـهِ بُـرْدٌ نَـجْـرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَاَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً - قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ اِلَـى صَـفْـحَةِ عَـاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَ قَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الـرِّدَاءِ مِـنْ شِـدَّةِ جَبْذَتِهِ - ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِىْ مِنْ مَـالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদরখানা ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদরখানা টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর। তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার দিয়ে তাকিয়ে হেঁসে দিলেন এবং তাকে কিছু দান করার আদেশ করলেন (বুখারী হা নং ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসলিম হাঃ নং ১০৫৭)।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ (ক) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর পাওয়ার অফ পজিটিভিটি (ইতিবাচক শক্তি) দ্বারা পাওয়ার অফ নেগেটিভিটি (নেতিবাচক শক্তি) কে দমন করেছেন। (খ) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর হিউমার (Humor : কৌতুকরসবোধ) দ্বারা ক্রোধকে দমন করেছেন। আমাদের সাথে যখন রেগে যাওয়ার মত কিছু ঘটে, তখন লক্ষ্য করলে আমরা দেখব ঘটনাটার একটা হিউমেরাস দিকও আছে। আমাদের উচিত হবে ঘটনার রাগের অংশটি উপেক্ষা করে হিউমেরাস অংশটির দিকে মনযোগ দেওয়া।

(৪) মানসিক ক্ষতি ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক ও জিহ্বা দুটোই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, ফলস্বরূপ আমরা পূর্বাপর চিন্তাভাবনা না করেই হুটহাট কিছু করে বসি বা বলে দিই যেমন ''তালাকের মত ভয়ংকর সম্পর্ক বিচ্ছেদকারী শব্দ''। যদিও ইসলাম রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেওয়াকে অনুমোদন করেনা, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, আজ মুসলিম সমাজের সিংহভাগ মানুষই ইসলামের থেকে মাযহাবী ফাতাওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরে সারাজীবন এর মাশুল গুণতে হয় অনুশোচনা করে আর না হয় সুযোগ হাতছাড়া করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বিষন্নতা হল চেপে রাখা ক্ষোভ। রাগ বা ক্ষোভ আসলে জীবনের আনন্দকেই কেড়ে নেয়। কোনো বিষয়ে রেগে গিয়ে বিষয়টির সমাধান করতে না পারলে আমাদের মধ্যে বিষন্নতা তৈরি হয়। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। রাগ দেখিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান করা যায় না। শুধু শুধু মানুষের কাছে অপ্রিয় হতে হয়।

(৫) শারীরিক ক্ষতি ঃ নিয়মিত রাগ স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। ন্যাচারাল হেলথ্ প্র্যাক্টিশনার ড. মারকোলার মতে, স্বয়ংক্রিয় রাগের প্রতিক্রিয়ায় শারীরিক যে সমস্যাগুলো হতে পারে তা হল, ''মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, ভারসাম্যহীনতা, ইনসমনিয়া (অনিদ্রা), অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন, উচ্চ রক্তচাপ, ত্বকের সমস্যা ও এক্রিসমা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদি।'' রাগের উন্মত্ততার ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলি লক্ষ্য করা যায় তা হল — (ক) হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় ঃ অতিরিক্ত রাগ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, টানা দুই ঘণ্টা যদি কেউ ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে তাঁর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় বহুগুণে।

রাগের প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে হৃৎপিণ্ড। ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা ৫০ বছর ও তার চেয়েও অধিক বয়সের মানুষের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা

করেন। সেখানে দেখা যায় যে, মাত্রাতিরিক্ত মেজাজের মানুষদের ধমনীতে অন্যদের তুলনায় বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হয়। যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বৃদ্ধি করার প্রাথমিক কারণ। এই গবেষণার লেখক ব্রুস রাইট বলেন, রাগে ফেটে পড়লে স্ট্রেস হরমোন তরঙ্গায়িত হয় এবং রক্তনালীর আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার বাস্তব উদাহরণ হল ডা. জন হান্টারের মৃত্যু। ক্রোধের বিস্ফোরণই হৃদরোগের অন্যতম কারণ-এ সত্যটি আবিষ্কার করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সেন্ট জার্জেস হাসপাতালের বিখ্যাত ডাক্তার জন হান্টার তার জীবনের বিনিময়ে চিকিৎসা জগতে জন হান্টার অতি পরিচিত নাম। তার সফল চিকিৎসার সুখ্যাতি বিশ্বময় কিংবদন্তির ন্যায় ছড়িয়ে আছে। বদমেজাজের জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তার সাথে রোগিরা একটু অপ্রত্যাশিত আচরণ করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তেন, স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেন। এ সময় তার বুকে মৃদু যন্ত্রণা হত। এ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা যে দিন বেশি হত সেদিন যন্ত্রণা অসহ্য রকমের হত। ডাক্তার হান্টার তার বন্ধুদের বলতেন, দেখ, যদি আমার আকস্মিক মৃত্যু হয় তাহলে বুঝবে আমার ক্রোধের কারণেই হয়েছে।

একদিন তার চেম্বারে একজন খুঁতখুঁতে মেজাজের রোগী এলেন। তার কী রোগ হয়েছে, এ রোগ কেন হয় এরকম বহু প্রশ্ন করে ডাক্তারকে উত্যক্ত করে তুললেন। ডাক্তার তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ক্রোধে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েন। বুক চেপে ধরে রোগিকে বললেন, মাফ করবেন, আমি একটু পাশের রুমে যাচ্ছি। পাশের রুমের মেঝেতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। বলা যায় তখন থেকেই মানুষ হৃদরোগের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হিসাবে এই ক্রোধের বিস্ফোরণকেই দায়ী করে আসছে।

(খ) স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়েঃ অতিরিক্ত রাগ কিন্তু স্ট্রোকেরও ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যদি আপনার ক্রোধ অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে আপনাকে দ্রুত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা, এটি মস্তিষ্কের ওপর প্রচণ্ড হারে চাপ সৃষ্টি করে। এতে মস্তিষ্কের রক্তনালিগুলো বন্ধ হয়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

(গ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ঃ বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘‘টানা ছয় ঘণ্টা মন-মেজাজ খারাপ থাকলে বা রেগে থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।’’ এতে শরীরের বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ (Infection) হয়।

এছাড়াও আমরা যখন রেগে যাই তখন আমাদের দেহে কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন হার্টরেট, ব্লাড প্রেসার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ফলে ঘাম হয় এ তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক করার জন্য। পেশি সংকুচিত হয় এবং হাত-পায়ে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় যেকোনো দৈহিক তৎপরতাকে পরিচালনা করার জন্য। অর্থাৎ ফ্লাইট অর ফাইট রেসপন্স সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,দীর্ঘসময় ধরে যদি এই রেসপন্স চলতে থাকে তাহলে অনেক ধরণের ক্রনিক রোগ হতে পারে। যেমন, ইনসমনিয়া, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, আলসার, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মৃগী, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইন, ফুসফুসের অসুখ ইত্যাদি।

(৬) আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায় ঃ আত্মহত্যার কারণ সমূহের মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। যা শতকরা মৃত্যুহারের একটি ভাল পারসেন্টেজ দখল করে আছে। প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পত্রপত্রিকা খুললেই দেখা যায় খুনাখুনি, মারামারি, বউ স্বামীকে হত্যা, স্বামী বউকে হত্যা অথবা রাগের মাথায় কেউ কাউকে গুলি করেছে। রাগ একটি ইমোশনাল বিষয়, যার বহিঃপ্রকাশ হয় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্নভাবে। যেমন কেউ নিজের শরীরে আঘাত করে, কেউ অন্যকে আঘাত করে, আবার কেউ আত্মহত্যা করে। যার প্রভাব পড়ে ব্যক্তির নিজের ওপর, তার পরিবারের উপর এবং সমাজের উপর। উদাহরণ স্বরূপ — (ক) বাবার কথায় রেগে কেরোসিন খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি যুবক। (খ) ব্যর্থ প্রেমিক রাগান্বিত হয়ে অ্যাসিড ছুড়ে হত্যা করল প্রেমিকাকে।

এ জন্যই ইসলাম রাগকে চিরতরে হারাম করেছে, না থাকবে হাতিয়ার না হবে হত্যা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَغْضَبْ، وَلَكَ الْجَنَّةُ

তুমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ কর, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত (সহীহুল জামে হা নং ৭৩৭৪)।

(৭) সফলতার পথে অন্তরায় ঃ সাফল্যের অন্তরায় হিসাবে মনীষীরা সব সময়ই রাগকে শনাক্ত করেছেন। বিশেষ করে হার্ভার্ড ডিসিশন সায়েন্স ল্যাবরেটরির মনীষীগণ। রাগান্বিত অবস্থায় রাগের বিষয়গুলো সর্বদা মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে থাকায় অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ কমে যায়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হয়।

পরবর্তী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

৩য় পর্ব

আসল আহ্‌লুস সুন্নাহ্ কে?

মূল ঃ ফাযীলাতুশ্ শায়খ হাফিয আব্দুল্লাহ্, ভাগলপুর
অনুবাদক ঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

হানাফী ঃ আপনারা কি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরও তাক্বলীদ করেন না?

মুহাম্মাদী ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাক্বলীদ করতেই বলেননি তো তাঁর তাক্বলীদ কীভাবে ও কেন করবো? তাছাড়া তাক্বলীদ বলা হয় কারো কথা বিনা দলীলে মানা। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রত্যেকটা কথা ও কর্ম শরীআত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তাক্বলীদ হতেই পারে না। তাক্বলীদ থেকে তো আল্লাহ্ সকল মানুষকে বাঁচিয়েছেন। এটা তো বিশাল বড় অভিশাপ। এর থেকে ভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে যে মানুষ তার গলায় এমন বেড়ি পড়ছে যে সম্পর্কে সে অবগত নয়।

হানাফী ঃ আমরা আমাদের ইমামকে জানি না?

মুহাম্মাদ ঃ আপনাদের কে বলল, যে তিনি আপনাদের ইমাম? তাঁকে ধরো এবং তাঁর পথ গলায় ঝুলাতে?

হানাফী ঃ যখন আপনারা একেবারেই কারো তাক্বলীদ করেন না তো আপনাদের ওহাবী বলা হয় কেন?

মুহাম্মাদী ঃ এটাই আমরা বুঝতে পারি না যে, হানাফীরা একদিকে গায়ের মুকাল্লিদ বলে আবার ওহাবীও বলে। অথচ কেউ গায়ের মুকাল্লিদ হলে ওহাবী কীভাবে? আর যদি ওহাবী হয় তো গায়ের মুকাল্লিদ কীভাবে? প্রকৃত কথা হল যত বিদআতী আছে সকলেই আহ্‌লুল হাদীসদের উপর হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। একারণেই তারা বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে। যেমনটি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেও বিরোধীরা কখনো পাগল, কখনো যাদুকর আবার কখনো মিথ্যুক বলেও অভিহিত করেছে। পীর আব্দুল কাদির জীলানীর দৃষ্টিতে 'আহ্‌লুল হাদীস' আমরা যে হক তার সাক্ষী তার সত্যায়ন করেছে। বিদআতীদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হল, তারা আহ্‌লুল হাদীসদের বিরূপ মন্তব্য করেও আজেবাজে বলে। আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র শুধুমাত্র একটাই নাম আর তা হল আহ্‌লুল হাদীস। আব্দুল কাদির জীলানির উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহ্‌লুল হাদীসকে যারা আজেবাজে বলে, তারা বিদআতী। আর যে বিদআতী সে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ হতেই পারে না।

নির্যাস হল ঃ—

১। আহ্‌লুল হাদীসকে যারা আজেবাজে বলে তারা আহ্‌লুস সুন্নাহ্ হতেই পারেনা।

২। যারা আহ্‌লুল হাদীসের বিভিন্ন নামে ভূষিত করে বা উল্টোপাল্টা নাম রাখে, তারা সকলেই বিদআতী আর বিদআতী আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ হতেই পারে না।

৩। আহ্‌লুস সুন্নাহ্ শুধুমাত্র আহ্‌লুল হাদীস। বাকিরা সকলেই জোরপূর্বক দাবীদার।

৪। যখন আব্দুল কাদীর জীলানী শুধুমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহ্‌লুল সুন্নাহ্‌কেই বলেছেন এবং আহ্‌লুস সুন্নাহ্ শুধুমাত্র আহ্‌লুল হাদীসদের বলেই উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি নিজেই আহ্‌লুল হাদীস ছিলেন।

৫। যখন জীলানী নিজেই আহ্‌লুল হাদীস ছিলেন এবং পীরে কামিল ছিলেন। সমস্ত মুসলিম অবগত যে, আহ্‌লুল হাদীসদের বড় বড় ওলী অতিবাহিত হয়েছেন।

৬। আলিম নামক জাহিলদের এটা বলা ভুল যে, কোনো আহ্‌লুল হাদীস ওলী হয়নি।

৭। যখন মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহ্‌লুস সুন্নাহ্ এবং আহ্‌লুস সুন্নাহ্ শুধুমাত্র আহ্‌লুল হাদীস আর ওলীর মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়াটা জরুরী, তো প্রমাণিত হল ওলী শুধুমাত্র আহ্‌লুল হাদীসই হতে পারে।

৮। যখন ওলী শুধুমাত্র আহ্‌লুল হাদীসই হতে পারে তখন প্রমাণিত হল যে, যত ওলী অতিবাহিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই আহ্‌লুল হাদীস ছিলেন।

৯। যিনি আহ্‌লুল হাদীস ছিলেন না, তিনি ওলীও ছিলেন না। যদিও অজ্ঞরা তাদের প্রসিদ্ধ করে রেখেছে।

১০। মুক্তির জন্য ও ওলী হওয়ার জন্য আহ্‌লুল হাদীস হওয়া অবশ্যক।

হানাফী ঃ আপনি তো আমাকে ভয় দেখিয়ে দিলেন।

মুহাম্মাদী ঃ আপনি তো ভাগ্যবান! আপনি বুঝতে পেরেছেন। তাছাড়া কত মানুষ যারা মুক্তির চিন্তায় করেনা। শুধু দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। আসল কথা হল আগে হক্ব বা সত্যকে জানুন তারপর অটল থাকুন হক্বের উপর।

হানাফী ঃ সত্যের সন্ধান কীভাবে পাওয়া যাবে? সকলেই নিজেকে হক্বপন্থী বলে।

মুহাম্মাদী ঃ হক্ব তো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতকে বলে এবং তার উপর আমল করাই হল মুক্তির পথ।

হানাফী ঃ সবাই তো বলে যে, আমি হক্বের উপর আছি। কীভাবে বুঝাবো কে হক্বের উপর আছে?

মুহাম্মাদী ঃ যে দ্বীনে বা ধর্মে মিশ্রণ ঘটায় না ওটা হক্ব। এর ভিত্তিতে প্রত্যেককে যাচাই করতে পারেন। দুনিয়ায় প্রত্যেক ফিরকা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পর নিজেকে কোনো না কোনো দিকে সম্বোধন করেছে। আর এটাই মিশ্রণের দলীল। আহ্‌লে হাদীসই এমন একটি জামাআত যা কোনো বা কারো দিকে সম্বোধিত নয় বরং শুধুমাত্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের উপর আমল করে যা হাদীস থেকে প্রমাণিত।

হানাফী ঃ সুন্নাতের অর্থ কী?

মুহাম্মাদী ঃ যা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত। যে রাস্তা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাকে সুন্নাত বলে আর তার উপর আমলকারীকে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ বলা হয়।

হানাফী ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত কীভাবে ও কোথা থেকে জানবো?

মুহাম্মাদী ঃ হাদীস পড়ে ও হাদীসের আলিমকে জিজ্ঞেস করে।

হানাফী ঃ হানাফী, আহ্‌লে হাদীসের মধ্যে যে কেউ হাদীসের আলিম হয়।

---

৩০ পৃষ্ঠার পর

একবার ভাবুন ২০০৬ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের প্রায় হিরো হয়ে যাওয়া জিনেদাইন জিদানের কথা। মুহূর্তের উত্তেজনায় মাতারাজ্জির ওপর চড়াও হয়ে পেলেন লাল কার্ড। সফলতার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েও আছড়ে পড়লেন। হারালেন সোনার জুতো ও ম্যান অফ দি সিরিজ জিতার সুবর্ণ সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে দল হারালো স্বপ্নের বিস্বকাপ। বাবুন মাইক টাইসনের কথা যে বক্সিং রিংয়ে প্রতিপক্ষ ইভাণ্ডার হোলিফিল্ডের কানের একটা অংশ কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে হারিয়েছিলেন শিরোপা।

৩য় পর্ব

أحكام الأذان والأقامة

আযান ও ইক্বামাতের বিধান

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(২৫) আযানের শব্দাবলী ঃ হাদীসে আযান দু রকমভাবে বর্ণিত হয়েছে। (ক) আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে আযান স্বপ্নে ফেরেশতার কাছে শিখেছিলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে আযান দিতেন —

اَلـلّٰـهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰــهَ اِلَّا الـلّٰـهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَـى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবর, আল্লা-হু আকবার, আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, হাইয়্যা আলাস্ব স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাস্ব স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফলা-হ, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।

(২৬) তারজী সহ আযান ঃ (খ) আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে আযানের সুন্নাত (নিয়ম) শিখিয়ে দিন। আবূ মাহযূরাহ্ বলেন, তিনি আমার মাথার অগ্রভাগে হাত বুলালেন অতঃপর বললেন —

اَلـلّٰـهُ اَكْبَـرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، تَرْفَعُ بِهَا

صَوْتَكَ، ثُمَّ تَـقُوْلُ : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُـحَـمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَـوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُـحَـمَّـدًا رَّسُـوْلُ الـلّٰـهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الـصَّلَاةِ ، حَـيَّ عَـلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَاِنْ كَـانَ صَلَاةُ الـصُّبْـحِ قُـلْـتَ : الـصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

বলো ঃ আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার। এই বাক্যগুলো তুমি উচ্চ স্বরে বলবে। এরপর তুমি নিম্ন স্বরে বলবে - আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ। অতঃপর তুমি পুনরায় উচ্চ স্বরে শাহাদাত বাক্য বলবে - আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, হাইয়্যা আলাস্ব স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাস্ব স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফলা-হ। এ আযান ফজরের স্বলাতের জন্য হলে বলবে, আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাওম, আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাওম। আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ (আবূ দাউদ হাঃ ৫০০ সূত্র সহীহ্, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩৭৯, নাসায়ী হাঃ ৬৩২ সংক্ষিপ্ত)।

(২৭) ফজরের দুই আযান এবং 'আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাউম' ঃ এ মর্মে উলামাগণের দুটি প্রসিদ্ধ মতামত রয়েছে। (ক) ফজরের দুই আযানের অর্থ ঃ ফজরের প্রথম আযান হল, ফজর উদিত হওয়ার পূর্বের আযান (সাহারী খাওয়ার বা তাহাজ্জুদের আযান)। আর দ্বিতীয় আযান হল, ফজর উদিত হওয়ার পরে আযান। এ মত পোষণ করেছেন আল্লামাহ আলবানী (সামারুল মুস্তাহাব ১/১২৯)। শায়খ হাফেয সানাউল্লা মাদানী, শায়খ মুনীর ক্বামার শিয়ালকোটী, হাফেয আব্দুর রউফ সিন্ধু (ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ্ ১/২৪৭) কিন্তু উক্ত মত সঠিক নয়। কারণ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বের আযানকে ফজরের আযান বলা যাবে না। (খ) ফজরের দুই আযানের অর্থ হল, ফজর উদিত হওয়ার পরের আযান আর দ্বিতীয় আযানের অর্থ হল, ফজর স্বলাতের ইক্বামাত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

অর্থ ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে (দু রাকাআত) স্বলাত আছে (সহীহুল বুখারী হাঃ ৬২৪, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৩৮৪)। এ মত গ্রহণ করেছেন আবূ জাফার আত্ তাহাবী (শারহু মা'আনিল আ-সার ১/১৩৭), আল্লামাহ ইবনু হাযম যাহিরী (আল্ মুহাল্লা ৩/১৫০), ইমাম নাবাভী (আল্ মাজমূ শারহুল মুহায্যাব ৩/১০২), আল্লামাহ্ শাওকানী (আস্ সাইলুল জার্রার ১/৪৪৮), আল্লামাহ্ ইবনু উসাইমীন (মাজমূ ফাতাওয়া অরাসাইল ১২/১৭৮-১৮৬, ফাতাওয়া নম্বর ১০০ ও ১০২), হাফেয যুবায়র আলী যায়ী (ফাতাওয়া ইলমিয়্যা ১২৪৭-১২৪৮) শায়খ আমীনুল্লাহ বাশাওয়ারী (ফাতাওয়া আদ্ দ্বীনুল খালিস্ব ৩/২২৩-২২৫)। এছাড়া একটি তৃতীয় আযান আছে যা ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে দেওয়া হয়। একে ফজরের আযান বলা যাবে না। কারণ সময়ের পূর্বে কোনো আযান জায়েয নয়। বরং এটাকে বলতে হবে রাতের আযান অথবা সাহরী খাবার আনান। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন

اَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

নিশ্চয় বিলাল রাত্রের আযান দেয় তখন তোমরা খাও এবং পান করো। যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতূম আযান দেয় (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬১৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮২৭)।

যেসব হাদীসে আছে যে, 'আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাউম' ভোরের প্রথম আযানে বলতে হবে, সেসব হাদীসের অর্থ হবে, ফজর উদিত হওয়ার পরের দুই আযান (আযান ও ইক্বামাত)

এর মধ্যে প্রথম আযান (প্রচলিত আযানে) এ শব্দাবলী বলতে হবে ইক্বামাতে বলতে হবে না। আর রাত্রের আযান যা ভোর হওয়ার আগেই দেওয়া হয়, তাতে 'আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাউম' শব্দাবলী প্রমাণিত নয়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—

مِنَ السُّنَةِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যে, ফজরের আযানে মুয়ায্যিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে নিবে, তখন বলবে 'আস্ স্বলাতু খায়রুম্ মিনান্ নাউম' (সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ হাঃ ৩৮৬, সুনানুদ দারাকুতনী হাঃ ৯৪৪, বাইহাকীর সুনানুর কুবরা হাঃ ১৯৯৪ সূত্র সহীহ্)। হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী কোনো সাহাবী যখন 'মিনাস্ সুন্নাতি' সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বলবেন তখন তার অর্থ হবে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস। এমনিভাবে তিনি আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফজরের আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর উক্ত শব্দাবলী বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই তিনি বলতেন (আবূ দাউদ হাঃ ৫০৪, সূত্র সহীহ্)।

সারকথা হল (ক) ফজর উদিত হওয়ার পর যে আযান ফজর স্বলাতের জন্য দেওয়া হয়, যে আযান সাহরী খাওয়া নিষিদ্ধ এবং ফজর স্বলাতকে বৈধ করে সেই আযানে 'আস্ স্বলাতু খয়রুম্ মিনান্ নাউম' বলতে হবে। এটাই হল, ইক্বামাতের তুলনায় ফজরের প্রথম আযান। আর ইক্বামাত হল দ্বিতীয় আযান। (খ) আর ফজর উদিত হওয়ার পূর্বের আযানে (সাহারী খাওয়া বা তাহাজ্জুদের আযানে) উক্ত শব্দাবলী বলা, আদৌ কোনো সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(২৮) তাজবীদের মূলনীতি অনুযায়ী আযান দেওয়া ঃ ক্বারীগণের নিকট তাজবীদের কিছু বিধান রয়েছে। যেসব বিধান আরবী ভাষার বর্ণসমূহ উচ্চারণের জন্য এবং শব্দের শেষ বর্ণের স্বরধ্বনি নিরূপণের জন্য জানা আবশ্যিক। সেই মূলনীতি ভুল হওয়াকে ক্বারীগণ প্রকাশ্য ভুল বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এসব বিধানে মুয়ায্যিনের মনোযোগী হওয়া অপরিহার্য। কেননা এ ধরণের ভুলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আবার কিছু ভুল যাকে প্রকাশ্যে ভুল বলা হয়। যেমন, ইদগাম, গুন্নাহ্ ইত্যাদি। আযানে এ সবেরও প্রয়োগ দরকার কিন্তু আবশ্যিক নয়। কারণ এর দ্বারা আওয়ায সুন্দর ও সুসজ্জিত করা হয়। আর সমস্ত ফক্বীহগণ আযানের আওয়ায সুসজ্জিত করা সুন্নাত হওয়ায় একমত। কেননা আযান মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের নিকট নিজেকে প্রিয় করে।

(২৯) আযানের শব্দাবলীতে সংযোজন অথবা বিয়োজন করা ঃ প্রকাশ থাকে যে, আহ্লে সুন্নাত অল জামাআত অর্থাৎ আহ্লে হাদীস এবং চার মাযহাবের আযানে কোনো পার্থক্য নেই। সকলের আযানের পদ্ধতি এক এবং শব্দাবলীর সংখ্যাও এক। কিন্তু শীয়াদের আযান অনেকটাই ভিন্ন। যেমন শীয়াদের ফিরকাহ্ জাফারিয়াদের আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফাল-হ'র পর এতটার বেশি 'হাইয়্যা আলা-খাইরিল আমাল' আছে বিস্তারিত জানতে দেখুন (মুবাশ্শের আহমাদ রব্বানীর 'আপকে মাসাইল আউর উনকা হাল' ১/১০২-১০৭) এবং তাদের একটি ফিরকাহ্ মুফাব্বেযাহ্, এদের আযানে 'মুহাম্মাদিউ অ আ-লিমুহাম্মাদিন খইরিল বারিয়্যাহ' দুবার এবং তাদের কিছু বর্ণনায় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্-র পর দু'বার 'আশহাদু আন্না আলীয়ান অলীউল্লাহ' বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার তাদের মধ্যেই কিছু লোক সে স্থানে বলে 'আশহুদ আন্না আমীরাল মুমিনীনা হাক্বক্বান'। সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত শব্দাবলীর অর্থ সঠিক হলেও, সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত প্রকৃত আযানে তা নেই। ফলে এটা শরীয়তে সংযোজন এবং নিকৃষ্টতম বিদআত। এমনকী তাদের মাযহাবেরই গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল মাবসূতে (১/৯৯) বলা হয়েছে যে, আযানে উপরোক্ত শব্দাবলী বললে পাপ হবে। আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুহাম্মাদ জাওয়াদের লিখা বই 'ফিকহুল ইমাম জা'ফার আস্ সাদিক' ১/১৬৬, আল্ লাম্পআতিদ দিমেশকিয়ার ১/২৪০)।

(৩০) বৃষ্টি চলাকালীন আযান কীভাবে দিতে হয় ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে —

أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَ رِيحٍ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَ مَطَرٍ، يَقُوْلُ : أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ.

তিনি এক শৈত্যপ্রবাহে শীতের রাতে স্বলাতের আযান দিলেন। আযান দেওয়ার পর তিনি বললেন, সাবধান তোমরা

নিজ নিজ আবাসে (বাড়িতে) স্বলাত আদায় কর। এরপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঠাণ্ডা শীত-বৃষ্টি মুখর রাত্রে মুয়ায্যিনকে আদেশ দিতেন যে, আযান দেওয়ার পর যেন বলে দেয়, 'সাবধান! তোমরা নিজ নিজ আবাসে স্বলাত আদায় কর' (বুখারী হাঃ ৬৬৬, মুসলিম হাঃ ১১২৫) এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারিস বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক বৃষ্টি মুখর রাতে তাঁর মুয়ায্যিনকে বললেন —

إِذَا قُلْتَ : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ.

যখন তুমি হাইয়্যা আলাস্ স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাল্ ফলা-হ বলার স্থানে পৌঁছাবে তখন এর পরিবর্তে 'আলা-স্বাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' বলবে। একথা শুনে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল- যেন তারা বিষয়টাকে অপছন্দ করল। তিনি বললেন, তোমরা কি এতে আশ্চর্যিত হচ্ছো? আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তিনিই এরূপ করেছেন (বুখারী হাঃ ৯০১, মুসলিম হাঃ ১১২৮)।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! হাদীস দুটির প্রতি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, বৃষ্টি মুখর রাতে বাড়িতে স্বলাত আদায়ের ঘোষণা দেওয়ার স্থান দুটি (ক) আযান শেষে এবং (খ) হাইয়্যা আলাস্ স্বলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফলা-হ বলার স্থানে। প্রকাশ থাকে যে, কিছু সাধারণ লোক এটাকে সফরের সাথে নির্দিষ্ট মনে করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

(৩১) আযানের শব্দাবলীতে তামতীত করা ঃ 'তামতীত' শব্দের অর্থ হল, প্রসারিত করা, স্বরধ্বনি দীর্ঘ করা, টেনে লম্বা করা। অর্থাৎ আযানের শব্দাবলীতে যেখানে টান নেই সেখানে টান দিয়ে তার অর্থ পরিবর্তন করে দেওয়া যেমন, আল্লাহু আকবার এর মানে আল্লাহ্ মহান। কিন্তু 'আকবার' এর বায়ে টান দিয়ে 'বা-র' পড়লে অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্ একটি ঢোল (নাউযুবিল্লাহ্)। ঠিক তেমনি আল্লাহ্র শব্দের শুরুতে টান দিয়ে 'আ-ল্লা-হ' পড়লে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্ কি সত্যই মহান? প্রশ্নবাচক হয়ে যাবে (আল্ বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ্ শাফিয়ী ২/১৬৯)। ফলে আযানের শব্দে বেশি টান দেওয়া জায়েয নয়। আল্লামাহ্ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন—

وَأَمَّا التَّلْحِيْنَ : فَهُوَ التَّطْوِيْلُ وَ التَّمْطِيْطُ ، وَ هُوَ مَكْرُوْهٌ فِى الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.

আর তালহীন হল, ধ্বনি কে দীর্ঘায়িত করা এবং প্রলম্বিত করা। আর এটা আযান ও ইক্বামাতে অপছন্দনীয় (মাজমূ ফাতাওয়া ১০/৩৪০)। শায়খ আবূ বাকার যায়িদ বলেন —

وَ كَانَ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِى الصَّوْتِ وَ الْأَدَاءِ فِى الْعِبَادَاتِ : بِدْعَة التلحِيْنِ وَ التطريبِ فِى الأذانِ، وَ فِى الذِّكْرِ، وَ فِى الدُّعَاءِ، وَ فِى الصَّلَاةِ على النَّبِى ﷺ ، وَ الترَنُّم فِى خُطبَةِ الجُمُعَةِ ....

আর আওয়াযে ও ইবাদাত সম্পাদনের পদ্ধতিতে মানুষ যে সমস্ত আবিষ্কার করেছে, তন্মধ্যে আযানে গানের সুর দেওয়া, দুআ ও যিকরে সুরারোপ করা, মিষ্টি সুরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি স্বলাত (দরূদ) পড়া, জুমুআর খুতবায় সুমধুর কম্পন সৃষ্টি করা এবং দুআ ও যিকর সুউচ্চ স্বরে বলা (তাস্বহীহুদ দুআ ১/৮২)। শায়খ মুহাম্মাদ স্বালেহ আল্ মুনাজ্জিদ বলেন —

لَا يَجُوْزُ التَّغَنِّى بِالأذانِ وَ التطريبُ به، وَ لَيْسَ هُوَ كَحُرمَةِ الغِنَاءِ ، بَلْ هُوَ مَتَرَدِّدٌ بَيْنَ الكَرَاهَةِ وَ التحريمِ اِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ المَعْنَى فَيَحرُمُ.

গানের সুরে আযান দেওয়া গানের মত হারাম নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সুর আযানের শব্দের অর্থ পরিবর্তন না করবে, হারাম এবং মাকরূহ-র মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। আর অর্থ পরিবর্তন হলে হারাম (মাকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জওয়াব ৫/১২৫১) এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আস্ শানক্বীতী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন—

وَ التَّطْرِيْبُ وَ التَّمْطِيْطُ فِى الأَذَانِ لَيْسَ مِنْ هَدِيِّ

السَّلَفِ الصَّالِحِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم، وَ لِذٰلِكَ نَصَّ الْعُلَمَاءُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ عَلٰى اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ عَلٰى أَنَّه بِدْعَةٌ فِى الْأَذَانِ، وَ إِنَّمَا يُؤَذِّنُ الإِنْسَانُ أَذَانًا لَا يُخْرِجُ أَلْفَاظَ الأَذَانِ عَنْ مَدْلُولَاتِهَا، بَعِيْدًا عَنِ التَّكَلُّفِ وَ إِطَالَةِ الْمُدُوْدِ وَ التَّرَانِيْمِ وَ نَحْوِهَا.

আযানের ধ্বনিকে দীর্ঘায়িত করা এবং প্রলম্বিত করা সালাফে স্বলেহীন (রাহেমাহুল্লাহ আলাইহিম) এর পদ্ধতি ছিল না। কাজেই উলামাগণ তাঁদের মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্বেও বলেছেন এটা আযানে বিদআত এবং মানুষ ভাল ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে থেকে বেশি সুর না দিয়ে এবং মাদ সমূহকে বেশি প্রলম্বিত না করে। এমনভাবে আযান দিবে যেন আযানের শব্দাবলী তার অর্থ ও ভাব থেকে বেরিয়ে না যায় (শারহু যাদিল মুস্তানকিহ্ ২৯/১০)।

(৩২) টেপ রেকর্ডার দ্বারা আযান ঃ আল্লামাহ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন - টেপ রেকর্ডার দ্বারা আযান সঠিক নয়। কারণ তা পূর্বেকার আযানের বর্ণনা। আর আযান হল একটি ইবাদাত। এমনকী ইমামতির চেয়েও উত্তম ইবাদাত। যেমন কোনো ইমামের স্বলাত রেকর্ড করে মানুষকে সেই রেকর্ডারের অনুসরণ করতে বলা সঠিক হবে না, ঠিক তেমনি আযানের ব্যাপারেও রেকর্ডারের উপর ভরসা করা সঠিক হবে না (আশ্ শারহুল মুমতি ২/৬৯)।

শায়খ মাশহুর বিন হাসান লিখেছেন, রেকর্ডকৃত আওয়ায দ্বারা আযান দেওয়াতে বহু ভয় ও বিপদ আছে। যথা —

(ক) মুয়ায্যিনগণের প্রতিদান হারিয়ে যাওয়া এবং তা প্রকৃত মুয়ায্যিনের উপর সীমাবদ্ধ করে দেওয়া।

(খ) নিম্নোক্ত হাদীসের বিরোধীতা করা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُم أَحَدُكُم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

স্বলাতের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের স্বলাতের ইমামতি করবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬২৮, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১০৮০)।

(গ) ইসলামী শরীয়তের হিজরতে প্রথম দিন থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের প্রত্যেক অক্তে প্রত্যেক মাসজিদে যদিও এক শহরে একাধিক মাসজিদ থাকে মুসলিমদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে আযানের যে ধারাবাহিকতা আছে তার বিরোধিতা।

(ঘ) আযানের জন্য নিয়্যাত করা শর্ত। এজন্য পাগল, নিশাগ্রস্ত এবং এ ধরণের কোনো লোকের আযান সঠিক নয়। কারণ তার আমল সম্পাদনে নিয়্যাত থাকে না। ঠিক তেমনি টেপ রেকর্ডিংগে নিয়্যাত থাকে না।

(ঙ) আযান হল একটি শারীরিক ইবাদাত। ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয় যে, অন্যের আযানের উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা তা হল একটি ইবাদাত। সুতরাং তা দু'জনে মিলে-জুলে করলে সঠিক হবে না। যেমন স্বলাত, নিজের স্বলাত নিজেই আদায় করতে হয় কারুর উপর নির্ভরশীল হওয়া যায় না।

(চ) আযানের মাশরুয়ীয়াত, তার আদব ও সুন্নাত প্রত্যেক মাসজিদের প্রত্যেক স্বলাতের সাথে সম্পৃক্ত, রেকর্ডকৃত আযানে সেই আদব ও সুন্নাত থাকে না এবং তাতে নিয়্যাতের শর্তসমূহ হাতছাড়া হওয়ার সাথে সাথে তার (রেকর্ডকৃত আযানের) সম্প্রচার করে তাকে (সুন্নাতকে) ধ্বংস করা হয়।

(ছ) এটা মুসলিমদের জন্য তাদের দ্বীনের সাথে খেলা করার পথ সুগম করা এবং তাদের ইবাদাতে ও প্রতীকে বিদআত অনুপ্রবেশের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা। যাতে করে সম্পূর্ণ আযান ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে রেকর্ডকৃত আযানকে যথেষ্ট মনে করা হয়।

উপরোক্ত কথাগুলির উপর নির্ভর করে ১২/০৭/১৪০৬ হিজরী শনিবার 'রাবেতা আলামিল ইসলামী'র পক্ষ থেকে মক্কা মুকার্রামায় অনুষ্ঠিত ইসলামী ফিকার সভার সদস্যগণ, সভার নবম অধিবেশনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

إِنَّ الاكتفاءَ باذاعةِ الأذانِ فى المَسَاجِدِ، عِنْدَ دُخُوْلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، بِوَاسِطَةِ آلةِ التسجِيْلِ وَ نحوِهَا، لَا يَجْزِئُ وَ لَا يَجُوْزُ فى أداءِ هٰذِهِ العِبَادَةِ، وَ لَا يَحْصُلُ بِهِ

الأَذَانُ الـمَشْـرُوْعُ، وَ أنـه يَـجِـبُ عَـلـى المُسلِمِيْنَ، مُبَـاشِـرَةَ الأَذَانِ لِـكـلِّ وَقتٍ مِن أوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فِى كُلِّ مَسْجِدٍ، على مَا تَوَارَثَه المُسْلِمُوْنَ مِنْ عَهْدِ نَبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا محمد ﷺ الى الآنَ.

স্বলাতের সময় প্রবেশের সাথে মাসজিদে রেকর্ড যন্ত্র দ্বারা আযান সম্প্রচারকে যথেষ্ট মনে করা সঠিক হবে না এবং উক্ত ইবাদাত সম্পাদন জায়েয হবে না আর সেই আযান দ্বারা শরীয়ত সম্মত আযান অর্জিত হবে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য স্বলাতের প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য প্রত্যেক মাসজিদে সরাসরি সেই পদ্ধতিতেই আযান দেওয়া আবশ্যিক হবে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগ হতে মুসলিমগণ যেভাবে ধারাবাহিকতার সাথে দিয়ে আসছে।

(৩৩) আযানের জন্য মাইক ব্যবহার করা ঃ মাইকে আযান দেওয়া জায়েয। (ক) আযানের উদ্দেশ্য হল স্বলাতের সময় সম্পর্কে মুসল্লীদেরকে অবহিত করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অধিক আওয়াজ বিশিষ্ট মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন —

اِنَّهَـا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَاِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك.

ইনশাআল্লাহ্ এ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে থাকো। আর সে আযান দিতে থাকুক। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে জোরালো (আবূ দাউদ হাঃ ৪৯৯, সূত্র সহীহ্, ইমাম তিরমিযী, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান, আলবানী, দারানী এবং হাফিয যুবায়র সকলেই সহীহ্ বলেছেন)।

(খ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি —

لَا يَسْـمَـعُ مَـدَى صَـوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَ لَا اِنْـسٌ وَ لَا شَيْءٌ، اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যতদূর পর্যন্ত জ্বিন, মানুষ (গাছ, পাথর) বা অন্য কিছু মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি শুনবে তারা সকলেই কিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬০৯, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৭২৩)। উক্ত হাদীসের বিশ্লেষণে হাফেয যুবাইর আলী যায়ী লিখেছেন, ''মাসজিদে অতি উত্তম মাইক স্থাপন করে প্রথম ওয়াক্তে দেওয়া উচিৎ'' (ইত্তেহাফুল বাসিম ১/৪৬৪)।

(গ) আমরা দ্বিতীয় পর্বের ১৬ নং ধারা থেকে স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা উঁচু স্থানে আযান দেওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে অতঃপর তাবেয়ী ও তাবা তাবেয়ীগণের যুগেও মিনারে অথবা কোনো ঘরের ছাদের উপরে আযান দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতি (জোরালো কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট মুয়ায্যিন নিযুক্ত করা এবং উঁচু স্থানে উঠে আযান দেওয়া) ছাড়া আওয়ায উঁচু করার জন্য তাঁদের নিকট কোনো বিকল্প পথ ছিল না। থাকলে তাঁরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। যখন আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মাইকের মত যন্ত্র আবিষ্কার করার তাওফীক দিয়েছেন, তাকে দ্বীনের কাজে মাধ্যম বানাতে কোনো অসুবিধা নেই। মাইকে আযান দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুহাক্কীক উলামাগণ প্রায় একমত। কারণ সম্প্রতি আযানের ধ্বনি পৌঁছিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই মাইক। এ মর্মে সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটিকে প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তরে বলেছেন —

يُشْـرَعُ رَفْـعُ الـصَّـوْتِ بالاذانِ وَ لَوْ كَانَ الرَّفْعُ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ ....

শরীয়তে আযানের ধ্বনি উঁচু করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যদিও তা মাইক দ্বারা উঁচু করা হয় (ফাতাওয়া লাজনাতুদ্ দায়েমাহ্ ফাতাওয়া নং ১৮৪৪০)। অন্যদিকে আযান শুনে শয়তান ভীষণ কষ্ট পায় এবং এত ভয় পায় যে, আযান শুনার সাথে সাথেই বায়ু ছাড়তে (বায়ু নির্গত করতে) আরম্ভ করে আর অনেক দূর পালিয়ে যায়...... (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬০৮, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩৮৯)। সুতরাং যত বেশি আওয়ায হবে ততবেশি কষ্ট পাবে এবং দূর যাবে।

(৩৪) আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ঃ উসমান ইবনু আবীল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

اِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার নিকট হতে সর্বশেষ যে ওয়াদা নিয়েছেন তা ছিল ঃ আমি এমন একজন মুয়ায্যিন রাখব যে, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেবে না (তিরমিযী হাঃ ২০৯, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৭১৫ সহীহ্)। উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী লিখেছেন —

وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا، وَاسْتَحَبُّوْا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ.

ইমাম তিরমিযী বলেন - বিশেষজ্ঞ আলেমগণ আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এটাই পছন্দ করেছেন যে, মুয়ায্যিন আযানের বিনিময়ে নেকীর প্রত্যাশী হবেন (জামে তিরমিযী ১/২৮৬)। আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। আমি আযান বললাম। যখন আমি আযান সম্পূর্ণ করলাম

ثُمَّ دَعَانِي حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ .

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে ডেকে একটি থলে দিলেন। যাতে চাঁদির মত কিছু জিনিস ছিল (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৭০৮, নাসায়ী হাঃ ৬৩৩ সূত্র সহীহ্। আলবানী এবং হাফেয যুবাইর আলী যায়ী সূত্র সহীহ্ বলেছেন)। ইমাম শাওকানী এই দুই হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন যে, যদি পারিশ্রমিক শর্তাধীন হয় তবে তা নিশ্চিতভাবেই হারাম হবে। তবে যদি না চেয়েই কিছু দিয়ে দেয়, তা নেওয়া জায়েয হবে (নাইলুল আউতার ১/৫২৮)। আল্লামাহ্ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ইমাম শাওকানীর এ সামঞ্জস্য সাধন অবশ্যই অতি উত্তম (তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৬৪৫)। আর এটাই সঠিক মত।

(৩৫) আযানের উত্তর দেওয়ার হুকুম ঃ এ বিষয়ে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক উলামাগণ অজেব বললেও অধিকাংশ মুহাক্কিক উলামাগণ আযানের উত্তর দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ বলেছেন। (ক) অজেবের দলীল ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

যখন তোমরা অযান শুনতে পাবে তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তাই বল (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬১১, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৭৬)। এখানে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদেশসূচক ক্রিয়া থেকে হানাফী ও যাহেরী মাযহাবের উলামাগণ আর মালেকীদের মধ্যে ইবনু অহাব এবং আবূ আওয়ানাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) অজেবের দলীল গ্রহণ করেছেন (ফাতহুল বারী ২/৯৩, মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ্ ১/২৪০, ফাতাওয়া হিন্দিয়াহ্ ১/৫৭)।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং অধিকাংশ উলামা সুন্নাত বলেছেন (ফাতহুল বারী ২/৯৩, মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/১২৫০)। এদের দলীল সমূহ। (ক) মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদেরকে নিজের গোত্রে যাওয়ার সময় বলেছিলেন —

فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

স্বলাতের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের স্বলাতের ইমামতি করবে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬২৮, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১০৮০)। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদেরকে আযানে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কিন্তু তার উত্তর দেওয়ার কথা বললেন না।

وَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ عُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

অর্থাৎ উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিম্বারের উপর বসে

থাকতেন এবং তাঁরা আপোষে কথা বলাবলি করতেন। মুয়ায্যিন যখন আযান দিয়ে চুপ হত উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুতবার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তখন আর কেউ কথা বলত না (শারহু মায়ানিল আসার হাঃ ২১৭৪ সূত্র সহীহ্)।

(৩৬) আযান চলাকালীন বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু দেওয়া ঃ শায়খ স্বলেহ আল্ মুনাজ্জিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন —

لَمْ يَثْبُتْ فِى تَقْبِيْلِهِمَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَىْءٌ فِيْمَا نَعْلَمُ، فَتَقْبِيْلُهُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ بِدْعَةٌ، وَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِى ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আমার জ্ঞান অনুযায়ী, আযান চলাকালীন মুয়ায্যিনের ''আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্'' বলার সময় শ্রবণকারীর বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু দেওয়ার ব্যাপারে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে কিছুই প্রমাণিত নয়। সুতরাং সেই সময় তাতে চুমু দেওয়া বিদআত। আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমাদের এই দ্বীনে যে ব্যক্তি কোনো নতুন কাজ উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা হবে প্রত্যাখ্যাত (মাওকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৮৭৭১)।

(৩৭) ''আস্ স্বলাতু খায়রুম্ মিনান্ নাউম'' এর উত্তরে কী বলতে হবে ? শায়খ মুল্লা আলী ক্বারী 'আল্ আসরারুল মারফূয়া ফিল আখবা রিল মাউযূয়া' গ্রন্থে ১/২৩১ দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন— (ক) বহু সাধারণ মানুষ এর উত্তরে বলে থাকে —

صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

উচ্চারণ ঃ স্বদাকা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সত্য বলেছেন (হাঃ ২৫৮ হাদীসটি ভিত্তিহীন এর কোনো সূত্র নেই)।

(খ) কিছু শাফেয়ী মাযহাবের লোক এর উত্তরে বলে থাকে — صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ وَ بِالْحَقِّ نَطَقْتَ

উচ্চারণ ঃ স্বদাক্বতা অ বারারতা অ বিল হাক্বকে নাত্বাক্বতা। অর্থ ঃ তুমি সত্য বললে (হাঃ ২৫৯ এটাও জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস।

এ মর্মে মুহাক্বক্বিক উলামাগণ যেমন ইবনু স্বলেহিল উসাইমীন, স্বলেহ আল্ মুনাজ্জিদ এবং হাফিয যুবাইর আলী যায়ী (রাহিমাহুমুল্লাহ্) বলেছেন, উপরোক্ত বাক্যগুলির শরীয়তে কোনো ভিত্তি নেই। বরং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদেশ ''যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তাই বল'' থেকে বুঝা যায় যে, আযানের প্রত্যেকটা বাক্যের উত্তরে সেই বাক্যই বলতে হবে কেবল ''হাইয়্যা আলাস্ স্বলাহ্ এবং হাইয়্যা আলাল ফাল-হ এর উত্তরে বলতে হবে 'লা হাউলা অলা কুউয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬১১, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৫৭৮)।

অকুতোভয় দায়ী ঃ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)

এম. এ. হান্নান

ইসলাম শাশ্বত এক জীবন ব্যবস্থারই নাম। সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্। সেই পৃথিবী সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক রচিত অমোঘ নিয়ম নীতিই হচ্ছে এই ইসলাম। যেখানেই এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা থাকে সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। ভূমণ্ডলে হোক অথবা নভোমণ্ডলে হোক মহান আল্লাহ্র এই নিপুণ বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সকল সমস্যা মুক্ত করা সম্ভব। তবে নভোমণ্ডলে আল্লাহ্র এই বিধানের বিরোধিতা হয় না সে জন্য সেখানে বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোনো সমস্যা। কিন্তু ধূলির ধরা এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় অসংখ্য সমস্যা ও লক্ষ লক্ষ জটিলতা। মহান রব্বুল আলামীন সুষমা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে পৃথিবীকে পরিচালনার জন্য মানুষের গড়া সকল মতবাদের উপর নিজের মতবাদকে বিজয়ী করার জন্য সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রেরণ করেন। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রেরণের মূল মিশন হচ্ছে এটাই। তাঁকে পাঠানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। তাঁকে প্রেরণের এই বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা মহাগ্রন্থের তিনটি জায়গায় আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন।

''তিনি (আল্লাহ্) সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন'' (৯/৩৩)। এই আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যই হচ্ছে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মিশন, ভিশন ও প্রেরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীন অর্থাৎ তাঁর দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা।

১। দ্বীন বিজয়ের অনিবার্য শর্ত দাওয়াতী কাজ ঃ বিখ্যাত তাফসীর 'আল্ বাহরুল মুহীত' এ দ্বীনের বিজয়ের বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পারজিত হয়েছে। তাদেরকে আরব ভূখণ্ড হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। রূম ও মাগরীব অঞ্চলে খৃষ্টানরা, পারস্যে অগ্নিপূজকরা, তুরস্ক ও ভারতে মূর্তিপূজকরা পরাজিত হয়েছে। সেখানে তার দৃষ্টিতে অন্য ধর্মের উপরে আল্লাহ্র দেওয়া জীবন ব্যবস্থার বিজয়ী বলতে ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত এই সকল বিজয়কে বোঝানো হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' এ দ্বীনের বিজয় বলতে বোঝানো হয়েছে, সেখানে অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা নয়; প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ প্রণীত জীবন ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে। মুসলিম দেশে ইসলামের কিছু কিছু অনুশাসন পালনে কোনো বাধা বিপত্তি না থাকলে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে পালনের সুযোগ না পাওয়া গেলে সেখানে দ্বীন বিজয় হয়েছে এ ধারণা ঠিক নয়। যেমন ধরুন, ভারতে স্বলাত আদায় করতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। ইচ্ছা করলে কেউ যাকাতও বিনা বাধায় আদায় করতে পারে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে এখানে সুদি অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বিচার বিভাগে ইসলাম উপেক্ষিত, সুতরাং এদেশ ৩০ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত হলেও বাস্তবে এখানে দ্বীন বিজয়ী নেই। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবস্থা প্রায় একই। কোথাও দ্বীন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নেই। মানুষের গড়া যে কোনো নিয়মনীতিকে অপসারণ করে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ্ প্রণীত জীবন-বিধান চালু হওয়ার নামই হচ্ছে দ্বীনের বিজয়। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই। তিনি সেই সমাজের রন্ধ্র-রন্ধ্র থেকে মানুষ রচিত সকল মতবাদকে উৎপাটন করে আল্লাহ্র দেওয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর রিসালাতের গুরুদায়িত্ব সফলতার সাথে পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এই দায়িত্ব পালনের প্রথম সোপান শুরু হয়েছে আপসহীন দাওয়াতের মাধ্যমে। বিপদসঙ্কুল পরিবেশে অদম্য উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতেই গোপনে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন নিরলসভাবে। তিনটি বছর অত্যন্ত সংগোপনে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই গুরুদায়িত্ব পালন করলেন। ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই তিন বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে নির্দেশ এলো প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের। উদাত্ত ঘোষণা ঘোষিত হল - তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দাও। আল্লাহ্র অকুতোভয় সৈনিক বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রকাশ্যে শুরু করলেন এই মহান কাজ।

২। দ্বীনের দাওয়াতের আপসহীন বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম) ঃ মানুষের সমাজ প্রকৃতিগত দিক থেকেই কোনো একটা নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই পরিচালিত হয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন ব্যবস্থা কোথাও বিজয়ী বেশে প্রতিষ্ঠিত না হলে সে স্থান কিন্তু এমনিত পড়ে থাকে না। অলক্ষ্যে সেখানে মানুষ রচিত জীবন ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সমাজের একশ্রেণির লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষ রচিত এই নিয়ম-কানুনের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা এই মানুষ রচিত মতবাদের প্রতি এত অন্ধ আনুগত্য দেখায় যে, এর পক্ষে তারা জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন ঐ সমাজে নতুন জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াতী কাজ করা সাংঘাতিকভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোনো ক্রমেও তারা অন্য জীবন ব্যবস্থার দাওয়াত গ্রহণ করে না। সে জন্য সেখানে আল্লাহ্‌র দেওয়া শাশ্বত জীবন ব্যবস্থাও অনায়াসে বিজয় লাভের সুযোগ থাকে না। প্রতিষ্ঠিত বাতিল জীবন ব্যবস্থার সাথে নতুন শাশ্বত দাওয়াতের সংঘর্ষ শুরু হয়। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর এই চিরাচরিত নিয়মের সেখানেও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেই আরব সমাজে জাহিলী জীবন ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বার্থান্বেষী একশ্রেণির লোক এই জীবন ব্যবস্থার এমন ভক্ত ছিল যে, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠল। জীবন বাজি রেখে তারা বিরোধিতা শুরু করল রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর। আল্লাহ্‌র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিরোধিতার মোকাবেলা করলেন আপোষহীনভাবে। তাঁর দ্বীন বিজয়ের অন্যতম মিশন সফল করার জন্য তিনি মিথ্যার সাথে সামান্য আপস করেননি। অবিচল পাহাড়ের মত অটল থেকে তিনি তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সামান্য ছাড় দেননি। দ্ব্যর্থহীনভাবে মোকাবেলা করেছেন সকল সমস্যার। দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন দুর্বার বেগে।

আমাদের সমাজে অনেক দ্বীনের খাদেম রয়েছে, এমনকী ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে দাবীদার রয়েছে, যারা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অনুসারী বলে আত্মতৃপ্তি পায়। তবে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সামান্য লোভ-লালসা দেখালেই আপোষ করতে কুণ্ঠিত হয় না। হিকমতের নামে অথবা যে কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে আপোষ করেই ক্ষান্ত হয় না, এর পক্ষে প্রচারণা চালাতেও লজ্জা পায় না। উল্লেখ্য যে, দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করতে করতে দ্বীনকে তারা একটা খেলার বস্তুতে পরিণত করে ছেড়েছে। পক্ষান্তরে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ছিলেন আপোষহীন এক মহাপুরুষ। তিনি দ্বীন বিজয়ের সূচনা পর্বে দাওয়াতী কাজ বলিষ্ঠভাবে শুরু করলেন। কুরাইশরা তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে এসে আপত্তি করল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিলেন। পক্ষান্তরে সত্যের প্রশ্নে আপোষহীন এই সিংহ পুরুষ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন - ''হে আমার চাচা! আল্লাহ্‌র শপথ, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্যকে এনে দেয় আর চন্দ্রকে রেখে দেয় বাম হাতে এই জন্য যে, আমি এই কাজ থেকে বিরত থাকব। আমি এই দ্বীনের বিজয় ছাড়া অথবা এই পথে আমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া আমি এ কাজ কখনও বর্জন করব না।'' সত্যের এই নির্ভীক সৈনিক রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এই আপোষহীন হতে মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি ছোঁড়া হল ঠাট্টা-বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাণ। তাঁকে অভিযুক্ত করা হল পাগল বলে। তাদের এই কথাকে কত সুন্দর করেই না আল্লাহ্ তুলে ধরেছেন, ''যখন তারা যিকর (কুরআন) শুনেছিল তারা তাঁকে বলল, নিশ্চয় সে পাগল। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলে তিরস্কার করল।'' আল্লাহ্ বলেন, কাফেররা বলল, এ তো হচ্ছে মিথ্যাবাদী যাদুকর সত্যের আপোষহীন এই নির্ভীক সৈনিক এসব মিথ্যা অভিযোগকে সামান্য পাত্তা দিলেন না। নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এগিয়ে চললেন দুর্বার বেগে। অতিমাত্রায় শুরু করতেন দাওয়াতী কাজ।

সর্বপ্রথম দাওয়াত দানের নির্দেশ পেয়ে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাফা পর্বতের যখন কুরাইশদের একত্রে করে এই দ্বীনের দিকে সকলকে আসার আহ্বান জানালেন, তখন থেকেই বিরোধিতার সূত্রপাত হল। আবু লাহাব তো একটি পাথর খণ্ড নিয়ে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মারতেও গিয়েছিল। নবুওয়াত লাভের পূর্বে আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবাহ ও উতাইবাহ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কন্যা রুকাইয়্যাহ ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিল। পিতার পিড়াপীড়িতে পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগী অজুহাতে তারা তাদের তালাক দিয়েছিল। উম্মে জামিল বিনতে হরব ছিল আবু সুফিয়ানের বোন ও আবু লাহাবের স্ত্রী। সে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ঘরের দরজায় প্রতি রাতে কাঁটা বিছিয়ে দিত। এসব অত্যাচার নিপীড়নে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সামান্যও

থমকে গেলেন না। রিসালাতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকলেন দাওয়াত দানের মাধ্যমে।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাবা চত্বরে স্বলাত আদায়ে নিমগ্ন। উকবা ইবনে আবি মুয়ীত উটের বিগলিত নাড়িভুঁড়ি এনে সিজদারত অবস্থায় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ওপর চাপিয়ে দিল। ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন, তখন তিনি মাথা উঁচু করতে সক্ষম হলেন। পাপিষ্ঠ এই উকবা ইবনে আবি মুয়ীত রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে একবার স্বলাত আদায় করা অবস্থায় গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলছিল। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা থেকে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মুক্ত করেন। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ক্ষান্ত হলেন না। যখন তারা আপোষহীন এই সিংহপুরুষকে শত কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিয়ে সত্যবিমুখ করতে ব্যর্থ হল। এরপর তারা তাঁকে লোভ-লালসা দেখিয়ে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে শুরু করল।

একদিন আবু অলীদ উতবা বিন রাবিয়া রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে এসে বলল, তুমি এই সব যা করছ এগুলো যদি ধনী হওয়ার উদ্দেশ্য করে থাক, তাহলে তুমি নিবৃত্ত হও, আমরা সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে আরবের সবচেয়ে ধনী করে দেব। যদি তুমি উচ্চ মর্যাদা চাও আমরা তোমাকেই আমাদের নেতা বানিয়ে দেব। তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করব না। যদি তুমি রাজা হতে চাও আমরা তোমাকে রাজা বানিয়ে দেব। যাঁর উদ্দেশ্য শুধু এই জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয়, সে কি আর পৃথিবীর এইসব লোভ-লালসার হাতছানিতে কখনো আপোষ করতে পারে? তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কুরআনের 'হা-মীম-সাজদা'হ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আমি আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার প্রশ্নে আপোষহীন। আমাদের সমাজের অনেকেই হয়তো আমরা এইরূপ পরিস্থিতিতে লোভ সংবরণ করতে ব্যর্থ হতাম। যে কোনো বাহানায় এ সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তা করেননি। এ ঘটনা তার আপোষহীনতার জাজ্বল্যমান সাক্ষী।

তিন বছর আবু তালিব উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকলেন সাথীদের নিয়ে ক্ষুধা পিপাসায় প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। আপোষহীন এ সংগ্রামী নেতা তবুও মাথানত করলেন না। সুযোগ পেলেই মক্কায় আগত প্রবাসীদের মাঝে উপস্থিত হতেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। রাতদিন তাঁর একটি মাত্র চিন্তা। আর তা হচ্ছে দাওয়াত।

কুরাইশ সরদাররা যুলুম নিপীড়নের দ্বারা মুহাম্মাদকে বশ করার ব্যাপারে আবার হতাশ হল। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে কোনো প্রকার রাজী করা যায় কিনা পুনরায় সেই চেষ্টা-তদবীর শুরু হল। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর একমাত্র অভিভাবক আবু তালিব তাঁকে কুরাইশ দলপতিদের সম্মুখে ডেকে বলল, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এরা কুরাইশ নেতা, তারা তোমাকে উদ্দেশ্য করে একত্রিত হয়েছে। তারা তোমাকে কিছু দিতে চায়, তোমার থেকে কিছু নিতে চায়। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অবস্থা দেখে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, তোমরা যদি একটা কালিমা গ্রহণ কর আরবরা সবকিছুর মালিকানা অর্জন করবে আর অনারবরাও তোমাদের অনুগত হবে। তোমরা বল ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং তাঁকে ছাড়া যার ইবাদাত তোমরা কর তাকে বর্জন কর। আপোষহীন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কী সুন্দর পদ্ধতি। আপোষ তো নয়ই বরং আবার সুযোগ বুঝে তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত শুনিয়ে দিলেন।

দ্বীন বিজয়ের জন্য দ্বীনী দাওয়াতের প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে তিনি শুধু মক্কার দ্বারে দ্বারে ঘোরেননি। নবুঅতের দশম সনের শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফ উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দিলেন। সেখানে তিনি দশদিন অবিরত এই দাওয়াতী কাজ চালালেন। কেউ তাঁর ডাকে সাড়া তো দিলই না বরং তাঁর পিছনে বখাটে ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে পাথরের দ্বারা তাঁকে রক্তাক্ত করল। পায়ের জুতো রক্তে আটকে গেল।

সত্যের এই আপোষহীন সৈনিক ভেঙ্গে পড়লেন না। দুর্বার বেগে এগিয়ে চললেন সম্মুখে। তিনি দাওয়াত নিয়ে ছুটে চলেছেন বিভিন্ন গোত্রে-গোত্রে। আরবের বিভিন্ন কোণায় কোণায়। তিনি আল্লাহ্‌র এই শাশ্বত বাণীর দাওয়াত দিলেন। বনু আমির ইবনু সাআ'সাআ, মুহারিব ইবনে খাসাফাহ্, ফাযারাহ্ গাস্সান, মুররাহ্, হানীফাহ্, সুলাইম, আবাস বনু নসর, বুল বাকা, কিনদাহ, কালব, আল্ হাবিস, ইবনু কায়াব, আমারাহ্, আল্ হারিমাহ প্রভৃতি গোত্রকে। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যান করল এই দাওয়াতকে। তাই বলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতাশ হলেন না। থমকে গেলেন না। আপোষ করলেন না। আরো শক্তি সঞ্চয় করে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন।

দ্বীনের এই আপোষহীন দায়ী মহান রবের এই দাওয়াত

নিয়ে ছুটেছেন এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। নবুঅতের একাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে মিনার তাঁবুতে তাঁবুতে ফিরেছেন এই দাওয়াত নিয়ে। মহান রবের করুণায় ইয়াসরিবের ছয়জন সৌভাগ্যশালী যুবক তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিলেন। দ্বাদশ বছরে নতুন আরো সাতজন ও ত্রয়োদশ বছরে সত্তর জন ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন বিজয়ের ক্ষীণ রেখা উদ্ভাসিত হল ধীরে ধীরে। ইয়াসরীব আল্লাহ্‌র দ্বীনে দুর্ভেদ্য কিল্লায় পরিণত হল।

রসূল প্রেমিক হওয়ার দাবীদারের এ সমাজে অভাব নেই। বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আপোষহীন মিশন দাওয়াতী কাজ না করে তার প্রেমিক হওয়ার সুযোগ নেই। এই বাস্তব সত্য আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি দাওয়াতী কাজ করেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। দাওয়াতী কাজে রক্ত ঝরিয়েছেন। এ কাজে আরাম আয়েশকে উপেক্ষা করেছেন। কারারুদ্ধ হয়েছেন। বয়কটের শিকার হওয়াতেও থমকে যায়নি। আর আমাদের দাওয়াত হচ্ছে মুরগির রান, রাজভোগ, পোলাও বিরিয়ানী প্রাপ্তির দাওয়াত। পাছে আসল কথা বললে দাওয়াত ছুটে যায় এই ভেবে সত্য গোপন করার মিথ্যা পদাচরণ। দাওয়াতী ময়দানে আপোষকামীতার মহড়া দান। 'আল্লাহ্ ভী খোশ রাহে' - 'ভগবান ভী নারাজ না হওয়ার' অনুশীলন। আল্লাহ্‌র শপথ, লাঞ্ছিত এ মুসলিম জাতিকে সম্মুখে অগ্রসর করতে হলে চাই বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মত আপোষহীন দায়ী। যারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না। বাধার হিমালয় সম্মুখে দেখেও যারা এই দ্বীনের সঠিক দাওয়াত অবিরাম দিয়েই যাবে। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মত আপোষহীন নিরলস কর্মচঞ্চল দায়ী হওয়ার যোগ্যতা দান করুন— আমীন।

১২ পাতার পর —

বেলায় আমরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বিষয়টি জানালাম। এই প্রেক্ষাপটেই নীচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় —

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقره : ١١٥)

তোমরা যেদিকেই মুখ কর, সেদিকেই আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল রয়েছে।

(ইবনু বায রহঃ) - যখন মুমিন কোনো মরুভূমিতে বা এমন বস্তিতে থাকবে; যেখানে কিবলার দিক সংশয়পূর্ণ হবে, অতঃপর সেই ব্যক্তি কিবলার দিক নির্ণয় করার পূর্ণ চেষ্টা করে নিজের প্রচেষ্টা অনুযায়ী স্বলাত পড়লে, তার স্বলাত সহীহ্ ও সঠিক হবে।[১]

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টা অনুযায়ী যে কোনো দিকে মুখ করে স্বলাত পড়ার পর জানতে পারে যে, সে কিবলামুখী হয়ে স্বলাত পড়েনি, তাহলে তাকে কি দ্বিতীয়বার স্বলাত পড়তে হবে, না প্রথম স্বলাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে— এ মসলাতে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে ঃ

(আহনাফ, হানাবেলা) - ইজতিহাদ বা চেষ্টা করে স্বলাত পড়লে দ্বিতীয়বার পড়া ওয়াজেব নয়।

(মালেকিয়্যাহ রহঃ) - এই স্বলাতের সময়ে দ্বিতীয়বার পড়া ওয়াজেব।

(শাফেইয়্যাহ) - যদি সেই স্বলাতের সময় অতিক্রান্তও হয়, তবুও দ্বিতীয়বার সেই স্বলাত পড়া ওয়াজেব।[২]

রাজেহ ঃ সেই স্বলাতের সময় অতিক্রান্ত হোক আর না হোক কোনো অবস্থাতেই দ্বিতীয় বার স্বলাত পড়া ওয়াজেব নয় যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দ্বিতীয়বার স্বলাত পড়ার নির্দেশ দেননি। ইমাম শওকানী এবং আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩]

ইবনু কুদামা হাম্বেলী ঃ এ কথাই বলেছেন।[৪]

১। ফাতাওয়া ইবনু বায মুতারজিম ১/৫৬।

২। আল্ ফিকহুল ইসলামী অ আদিল্লাতুহু ১/৭৬, সুবুলুস্ সালাম ১/৩০৭।

৩। নাইলুল আওতার ১/৬৭৭, আস্ সাইলুল জাররার ১/১৭৩, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৩৩৫।

৪। আল্ মুগনী লে ইবনে কুদামা ১/১১৩।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন ঃ কোন আনসারী সাহাবী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

উঃ— জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিআব আনসারী।

২। প্রশ্ন : কোন আনসারী সাহাবা বদর, ওহুদ, খন্দক সহ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন?

উঃ— জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিআব আনসারী।

৩। প্রশ্ন ঃ মুসআব বিন উমায়ের মদীনায় কার বাড়িতে অবস্থান করেন?

উঃ— আবু উমামাহ্ আস্আদ বিন যুরারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাড়িতে।

৪। প্রশ্ন ঃ মুসআবা বিন উমায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মদীনার লোকেরা কী বলে ডাকত?

উঃ— তাঁকে মক্করী অর্থাৎ পাঠদানকারী বা শিক্ষক বলে ডাকত।

৫। প্রশ্ন ঃ মুসআব বিন উমায়েরের প্রচারকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি কী?

উঃ— একদিন আসআদ বিন যুরারাহ্ তাঁকে সাথে নিয়ে বনু আব্দিল আশহাল ও বনু যাফরের মহল্লায় গমন করেন ও সেখানে একটি কুয়ার পাশে কয়েকজন মুসলিমকে নিয়ে বসেন। তখনও পর্যন্ত বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের দুই নেতা সা'দ বিন মু'য়ায ও উসায়েদ বিন তুয়ায়েল ইসলাম কবুল করেননি। মুবাল্লিগদের আগমনের খবর জানতে পেরে সা'দ-উসায়েদকে বললেন, আপনি গিয়ে ওদের নিষেধ করুন যেন আমাদের সরল সিধা মানুষগুলোকে বোকা না বানায়। ওসায়েদ বর্শা উঁচিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে বললেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখনি পালাও। মুসআব শান্ত ভাবে বললেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন ও কথা শুনুন। যদি পছন্দ না হয়, তখন দেখা যাবে। উসায়েদ বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন এবং মুসআবের বক্তব্য শুনে চমকিত হয়ে বলে উঠলেন, কতই না সুন্দর কথা এগুলিও কতই না মনোহর। এরপর তিনি ইসলাম কবুল করেন।

৬। প্রশ্ন ঃ উসায়েদ ইসলাম গ্রহণের পর কী করেন এবং কেন?

উঃ— সা'দ বিন মুআয-এর নিকট এসে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি'। তবে আমি তাদের নিষেধ করে দিয়েছি এবং তারাও বলেছে, আপনারা যা চান তাই করা হবে।' এই সময় উসায়েদ চাচ্ছিলেন যে সা'দ সেখানে যান। তাই কৌশল অবলম্বন করে বলেন, বনু হারেশার লোক জন্য আসআদ বিন যুরারাকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে এজন্য যে সে আপনার খালাতো ভাই। সা'দ ক্রুব্ধ হয়ে তখনই বর্শা হাতে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন মুসআব ও আসআদ নিশ্চিন্তে বসে আছে। তখন তিনি বুঝলেন যে, উসায়েদ তাদের কাছে পাঠানোর জন্য তার সঙ্গে চালাকি করেছে। তখন সা'দ ক্রুব্ধ স্বরে উভয়কে ধমকাতে থাকলেন এবং আসআদকে বললেন, তুমি আমার আত্মীয় না হলে তোমার কোনই ক্ষমতা ছিল না আমার মহল্লায় এসে বাজে কথা শুনাবার। আসাদের ইঙ্গিতে মুসাআব অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাষায় সা'দকে বললেন আপনি বসুন এবং আমাদের কথা শুনুন। অতঃপর পছন্দ হলে কবুল করবেন নইলে প্রত্যাখ্যান করবেন। অতঃপর তিনি মুসআবের বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন।

৭। প্রশ্ন ঃ সা'দ বিন মু'আয ইসলাম গ্রহণ করার পর কী করেন?

উঃ— ইসলাম গ্রহণ করার পর সেখানেই দু রাকাআত স্বলাত আদায় করেন এবং নিজ গোত্রে ফিরে এসে সবাইকে ডেকে বলেন, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর?' তারা বলল, আপনি আমাদের নেতা, সর্বোত্তম সিদ্ধান্তের অধিকারী ও আমাদের নিশ্চিন্ততম কাণ্ডারী।' তখন তিনি বললেন, তোমাদের নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনবে। একথার প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, সন্ধ্যার মধ্যে সকলেই ইসলাম কবুল করল মাত্র একজন তরুণ ব্যতীত (ইবনু হিশাম ১/৪৩৫-৩৭)।

৮। প্রশ্ন ঃ সা'দ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর গোত্রের যে তরুণ ইসলাম গ্রহণ করেনি তার নাম কী?

উঃ— আমর বিন সাবিত আল্ উসাইরিম।

৯। প্রশ্ন ঃ আমর বিন সাবিত আল্ উসাইরিম কোন্ দিন ইসলাম গ্রহণ করেন?

পরবর্তী অংশ ৪৭ পাতায়

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ মুসা (আলাইহিস্ সালামের) রূহ কবজ করতে আসা মালাকুল মাওত, মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার চোখে ঘুষি মেরে তিনি তা নষ্ট করে দেন, এই মর্মে বর্ণিত হাদীসটি কি সহীহ্? — জসীমুদ্দিন আনসারী, গুয়াহাটি, আসাম।

উত্তর ঃ জী, হ্যাঁ, হাদীসটি সহীহ্। হাদীসটি সহীহুল বুখারীর ১৩৩৯, ৩৪০৭ সহীহ্ মুসলিমের ২৩৭২, নাসায়ী ২০৮৯ নম্বরে উল্লেখিত আছে। মালাকুল মাউতকে মহান আল্লাহ্ মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট পাঠালেন তাঁর রূহ কবজ করার জন্য। তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে ঘুষি মারেন ও একটি চোখ নষ্ট করে দেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, আল্লাহ্ তুমি এমন বান্দার নিকট আমাকে পাঠালে যিনি মরতে চাননা। আল্লাহ্ তাঁর চক্ষুকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনঃ তার নিকট যাও ও বল তিনি তাঁর হাতটি একটি গরুর পিঠে রাখবেন। হাতের তালুর নিচে যত লোম ঢাকা পড়বে প্রতিটি লোমের পরিবর্তে এক বৎসর করে তোমাকে আয়ু প্রদান করা হল। মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এসব শুনে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন, মরণ। তখন তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, তাহলে এখনই মরণ দাও।

কেউ কেউ এটাকে নাবীর মর্যাদার জন্য হানিকর ভেবে ঘটনাকে ও হাদীসকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব করেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। উক্ত ঘটনা দ্বারা মৃত্যুর জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের যে পরিবর্তন হয় না তা বোঝানো হয়েছে। সহীহ্ হাদীসকে অস্বীকারকারী মূলতঃ ইসলামের অথেনটিক সোর্স তথা ইসলামকেই অস্বীকার করছে। আল্লাহ্ আমাদের আকীদাহ্ সুরক্ষিত রাখুন, আমীন।

২। প্রশ্ন ঃ ফিরআউনের সম্পর্কে অনেক কথা আল্ কুরআনে এসেছে। এখন প্রশ্ন হল, তার লাশ / মমি কি আল্লাহ্‌র রসূলের জীবদ্দশায় / যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে না তার পর হয়েছে। উত্তর দানে বাধিত করবেন। — মুহাম্মাদ সুজন, প্রবাসী, দুবাই।

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি আজ তোমার পার্থিব শরীরকে সংরক্ষিত রাখব, যাতে পরবর্তীগণের জন্য তুমি একটি নিদর্শন রূপে থাকতে পারো। নিশ্চয় বহু লোক আমার নিদর্শন সমূহ হতে গাফিল রয়েছে (সূরাহ্ ইউনুস ৯২)।

আল্ কুরআনের বর্ণনা, অলৌকিকভাবে আজও অম্লান। তার লাশ ৩০০০ বৎসরের অধিক সময় ধরে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে মিশরের জাদু ঘরে অবস্থান করছে। ১৮৯৮ সালে লোহিত সাগরের জাবালিয়ান নামক স্থানে ফিরআউনের দেহটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অতএব তা যে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি তা পরিস্কার। উল্লেখ্য যে মিশরের মমি করে রাখার পদ্ধতি ছাড়াই হাজার হাজার বৎসর ধরে অবিকৃত থাকাটা আল্লাহ্‌র অপরিসীম ক্ষমতার অকাট্য দলীল। এরপরেও যারা আল্লাহ্‌র কুরআনকে অস্বীকার করে তাদের পরিণতি কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৩। প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে প্রায় ৯৮ ভাগ মাসজিদেই দেখা যায় ফজরের স্বলাত শেষে সকলে সূরাহ্ হাশরের শেষ তিনি আয়াত পাঠ করেন। এটা পড়লে নাকি সত্তর হাজার ফেরেশতা তাদের জন্য দুআ করেন। এই মর্মে কি কোনো সহীহ্ দলীল আছে? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। জাযাকুমুল্লাহ্ খয়রা। — আবু আব্দুর রহমান, প্রবাসী, কুয়েত।

উত্তর ঃ এই মর্মে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। সুতরাং তা আমল যোগ্য নয় (যয়ীফুল জামি স্বগীর ৫৭৩২, যয়ীফ সুনানু তিরমিযী ২২)। বরং সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি দিনের বেলায় একশত বার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অ হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' পড়ে তাহলে সে দশজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার পুণ্য অর্জন করবে ও তার জন্য শত নেকি বরাদ্দ করা হবে এবং তার শত পাপ মাফ করা হবে। আর সেদিন সন্ধ্যে অবধি শয়তান হতে সুরক্ষা প্রদান করা হবে। তাছাড়া তার চাইতে উত্তম কর্ম কারো হবে না। তবে কেউ যদি তার চাইতে বেশি করে তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা (সহীহুল বুখারী ৩১১৯)।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাতে অতিরিক্ত কথা আছে যে, কেউ যদি একশত বার, কোন দিন সুবহানাল্লাহ-হি অ বিহামদিহী' পড়ে তাহলে সমুদ্রের ফেনা রাশি পরিমাণ পাপ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে (হাদীস নং ২৬৯১)। অবশ্য কাবীরাহ্ গুনাহ্‌র জন্য তাওবাহ্ করতে হবে।

৪। প্রশ্ন ঃ শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ্‌র

গোশতের বন্টন সম্পর্কে সহীহ্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আলোকপাত করবেন। — মাহীরুল ইসলাম, ইউ.এ.ই।

উত্তর ঃ এই মর্মে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে সরাসরি কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে প্রায় সকল আলিম একমত যে, আকীকাহ্‌র গোশতের ব্যবহার কুরবানীর গোশতের মতই করতে হবে। নিজে খাবে ও অন্যদের খাওয়াবে। কাঁচা গোশত্ও দিতে পারে এবং রান্না করেও খাওয়াতে পারে (মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু বায ১৮ খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা, ফিকহুল হাদীস, ২য় খণ্ড ৪৯৬ পৃঃ)।

৫। প্রশ্ন ঃ হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা কি বৈধ? বিভিন্ন প্রকার ঔষধে যে অ্যালকোহল ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন সিরাপ, টনিক ও হোমিও ঔষধাবলী। এমন ঔষধসমূহ কী ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুগ্রহ করে জানাবেন। — আশরাফুল আলম, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর।

উত্তর ঃ হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ নয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন — ''নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তাতে তোমাদের রোগ মুক্তি রাখেন নি'' (সহীহুল বুখারী, বাবু শারাবিল হাল্ওয়া ওয়াল আসাল)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ অসুখ ও ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা করো, কিন্তু তা হারাম দ্বারা নয়'' (তাবারানী, মুজামু কাবীর ৬৪৯, হাদীস সহীহ্)। অতএব হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ নয়।

হোমিওপ্যাথি বা অ্যালকোহল যুক্ত সিরাপ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মতপার্থক্যের শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য হোমিওপ্যাথিতে যে রেক্টিফাইড সুরা ব্যবহার করা হয় ঔষধকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তা হারাম মদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আমার মনে হয়। শুধুমাত্র তার টেকনিক্যাল নাম অ্যালকোহল যুক্ত হওয়াতেই অনেকে আপত্তি করেছেন। এই ঔষধের ব্যবহারে স্বল্প খরচে বহু জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী স্থায়ীভাবে নিরাময় লাভ করেছেন। আল্লাহ্ এ বিষয়ে সঠিকটি বেশি ভালো জানেন।

৬। প্রশ্ন ঃ 'ইজমা' শব্দের মানে কি? ইজমা কাকে বলে? এ বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন। — আব্দুর রহমান, দাঁইহাট, বর্ধমান।

উত্তর ঃ 'ইজমা' শব্দের অর্থ হল, কোনো বিষয়ে একমত হওয়া ও দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — ''ওই ব্যক্তির সিয়াম হবেনা যে ফজরের পূর্বে সিয়ামের চরম সিদ্ধান্ত নিলনা। (এটা অবশ্য) ফরয সিয়াম সম্পর্কিত'' (সহীহ্ নাসায়ী ২২০৩)।

আল্ কুরআনে আছে — ''তোমরা নিজেদের সাথীদের সাথে মিলেমিশে নিজেদের বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো'' (সূরাহ্ ইউনুস ৭১)।

ফুকাহাদের পরিভাষায় — রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরে শরীআতের কোনো দলীলের ভিত্তিতে কোনো এক সময়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা নতুন কোনো সমস্যা নিরসনের জন্য ঐক্যমত পৌঁছানোকে ইজমা বলে (ইরশাদুল ফুহুল ১/২৫৮ পৃষ্ঠা)।

ইজমার শর্ত সমূহ ঃ—

১। আলোচ্য মাসআলাতে ঐক্যমত পোষণকারী সমস্ত আলিমগণকে আল্ কুরআন সহীহ্ সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হের নীতি - নির্দেশ সমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে।

২। সারা বিশ্বের সমস্ত বিশেষজ্ঞগণকে অ্যাট এ টাইম একমত হতে হবে। কোনো একজন বিশেষজ্ঞ বিরুদ্ধে হলে ইজমা হবেনা।

৩। সমস্ত বিশেষজ্ঞগণ (সহীহ্) মুসলিম হবেন।

৪। ঐক্যমত প্রাপ্ত বিষয় যেন কার্যকরী হয়।

৫। ঐক্যমতের বহু পরে কোনো সদস্য যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন তাতে ইজমা দূষিত হবেনা।

৬। ইজমা শরীআতী বিষয়ে হতে হবে, পার্থিব বিষয়ে নয়।

৭। ইজমা অবশ্যই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরে হতে হবে।

৮। ইজমার আধার অবশ্যই শরীআতী কোনো দলীল হতে হবে। কল্পনা, অনুমান ও দুনিয়ার বিষয় নয়।

উপরোক্ত শর্তের ভিত্তিতে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়া সাহাবীগণের পরে প্রায় অসম্ভব। এজন্যই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, ''যে ব্যক্তি ইজমার দাবী করবে সে মিথ্যুক। সে কি করে জানল যে, তাঁরা ইখতিলাফ করেননি'' (তামামুল মিন্নাহ, ১ম খণ্ড ৩৬৬ পৃঃ)।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১৩.০১.১৯ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী তাঁর দারসে কুরআনে সূরাহ্ হুজুরাতের ১৪ ও ১৫ নং আয়াত দুটি ভাবার্থ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, মরুবাসী বেদুঈনগণ বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আল্লাহ্ বলেন, হে নাবী তুমি বল, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি বরং তোমরা বল - আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ বিশ্বাস এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি, তাছাড়া প্রথমেই ঈমানের দাবী করাও ঠিক নয়। ধীরে ধীরে উন্নতি লাভের পরই তোমরা ঈমানের কাঙ্খিত স্তরে পৌঁছতে পারবে, বরং প্রকৃত বিশ্বাসী তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করেনা এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে আর তারাই সত্যনিষ্ঠ।

তাই উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, ইসলামে মৌখিক স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। ঈমানের প্রকৃত দাবী হল প্রতিটি কাজ সন্দেহ মুক্ত হয়ে সম্পাদন করা। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম) এর মে'রাজের ঘটনার পর আবু বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিদ্দীক' হিসাবে পরিচিত হন। ঈমানের ব্যাপারে যারা দোদুল্যমান তাদের কোনো দুআও কবুল হয়না। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যেই কিছু অস্পষ্ট রয়েছে, যা অনেক মানুষ জানেনা, তবে যে ব্যক্তি অস্পষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নেবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৬২)। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন যে, যে কাজ সন্দেহ মুক্ত সেই কাজ অবলম্বন কর, সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধার সৃষ্টি হয় না। মিথ্যা ও শুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয় (মিশকাত ২৭৭৩)।

অতএব আমাদের সেই সমস্ত বিষয়কেই অগ্রাধিকার দিতে হবে যা উত্তম এবং যা সম্পূর্ণ ভাবেই সন্দেহ মুক্ত। তাই আসুন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের সন্দেহ মুক্ত হয়ে বিতর্কহীন বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

অদ্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

১। জমঈয়তের কোনো সদস্য জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের নীতিমালার বিরোধী এমন কোনো সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই যুক্ত থাকবে না।

২। বেলডাঙ্গা দাওয়া সেন্টার জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের দ্বীনি সম্পদ। তাই জেলা জমঈয়ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবেনা যা সরাসরি জেলা জমঈয়ত বিরোধী।

৩। আগামী মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী,২০১৯ এ জেলা সভা অনুষ্ঠিত হবে বেলডাঙ্গা দাওয়া সেন্টারে নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট সময়ে — ইন্‌শাআল্লাহ্।

এছাড়া বিবিধ বিষয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ—

(ক) জেলা জমঈয়ত অফিস কর্মী আরজাদ আলী ভাইয়ের মাসে অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হল যা আগামী মাস থেকে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ থেকে কার্যকর হবে।

(খ) বিগত ডিসেম্বর মাসে শামসের গঞ্জ ব্লকের পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ব্লক আমীর হিসাবে নিযুক্ত হন মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক, কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন মোঃ আলাউদ্দিন সাহেব।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৪৪ পাতার পর —

উঃ— ওহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম কবুল করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও শাহাদাত বরণ করেন (ইবনু হিশাম ২/৯০)।

১০। প্রশ্ন ঃ ইসরা শব্দের অর্থ কী?

উঃ— নৈশ ভ্রমণ।

১১। প্রশ্ন ঃ মিরাজ শব্দের অর্থ কী?

উঃ— সিঁড়ি।

১২। প্রশ্ন ঃ ইসরা ও মিরাজ কাকে বলে?

উঃ— মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তিনের বায়তুল মাকদেস মাসজিদ পর্যন্ত বোরাকের সাহায্যে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্বল্পকালীন নৈশ ভ্রমণকে ইসরা' বলা হয় এবং বায়তুল মাকদেস থেকে উর্দ্ধমুখী সিঁড়ির মাধ্যমে মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিরাজ' বলা হয়।

মাসিক "সরল পথ" ৭ম বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● জুমাদাল উলা-জুমাদিস সানী ১৪৪০ ● ফেব্রুয়ারী-২০১৯
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2019-20

মূল্য- ১৮/- টাকা মাত্র

Printed by : S.F. Printers, Beldanga, 9434 531 957